দুই ভাই

সুখলতা রাও

মিত্র ও ঘোষ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

আড়াই টাকা

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—কানাই পাল

মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও কালিকা প্রেস প্রাইভেট লি: ২৫, ডি. এল্. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে
শ্রীবাণেশ্বর মুখার্জ্জি কর্তৃক মুদ্রিত

দুই ভাই

এক

কলকাতার এক বড় রাস্তার উপরে প্রকাণ্ড এক বাড়ী। বাড়ীখানি সুন্দর সাজানো, ঘরে ঘরে ঝাড় লণ্ঠন আর টানা-পাখা। চেয়ার টেবিল খাট আলমারি সব ঝক্‌ঝক্ করছে। বসবার ঘরে, দেয়ালে কত ছবি আয়না, কত রকমের কাচের ফুলদানি, পিতলের উপরে নক্সাকাটা বাসন, জালিকাটা কাঠের তেপায়া, তার উপরে হাতীর দাঁতের নৌকো, শ্বেত-পাথরের তাজমহল। বসবার চৌকিগুলি সবুজ মখ্‌মলে মোড়া। কিন্তু এমন সুন্দর বাড়ী নিরানন্দ, বিষাদের ছায়ায় মলিন।

তার প্রথম কারণ, বাবু হরিধন বসু অর্থাৎ যাঁর বাড়ী, তিনি কঠিন রোগে বিছানায় শুয়ে, বাঁচবার আশা কম। দ্বিতীয় কারণ, বাড়ীতে ছেলেপিলে নেই। কেউ সেখানে ছুটোছুটি করে খেলা করে না, হাসে না, গোলমাল করে না। খোকাদের দাপাদাপি নেই, ছেলে-মেয়েদের স্কুলের তাড়া নেই, ভাইবোনে মিলে সন্ধ্যাবেলা ঠাকুমার কাছে গল্পশোনা নেই।

হরিধন বসু তাঁর মস্ত বাড়ীতে একলা আছেন। বছরখানেক হল তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন। আজ এক সপ্তাহ আগে হরিধন জ্বরে আক্রান্ত হন। টাইফয়েড রোগ বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। পুরনো চাকর ভজহরি দিন-রাত বাবুর বিছানার পাশে থেকে তাঁর সেবা করছে। দুই বেলা ডাক্তার যাওয়া-আসা করেন। আর

আসেন দেখতে দুই বেলা, তাঁর বন্ধু সত্যানন্দ বাবু। সত্যানন্দ বাবু একজন বড় উকিল।

হরিধন যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি হয়ত আর বেশী দিন বাঁচবেন না, তখন সত্যবাবুকে বললেন, "শোন সত্য, আমি এই বেলা উইলটা করে ফেলতে চাই। কখন কি হয় তা তো বলা যায় না!"

সত্যবাবু বললেন, "অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, হরিধন। তোমার বয়স বেশী নয়। এ অসুখ থেকে সেরে উঠবে বলে আমরা আশা করি। ডাক্তাররা নিরাশ হন নি।"

হরিধন—তা হোক। আমি নিজে বেশ বুঝতে পারছি, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তা ছাড়া আমার এত টাকাকড়ি, এর যদি একটা ভাল বিলিব্যবস্থা করে না যাই, তো পরে সাত ভূতে লুটে খাবে।

সত্যবাবু—সে ঠিক। তা হলে কালই আমি উইলের সব বন্দোবস্ত করি।

হরিধন—কর। আমার উইলের সব ভার কিন্তু তোমার হাতে দিলাম। তুমি দেখবে যে, আমি যাকে দিতে চাই, সে-ই যেন এ সম্পত্তি পায়। লোকে মনে করছে, খুব বড় একটা দান করে যাব। এরই মধ্যে কত সভা সমিতি থেকে আমাকে অভাব জানিয়েছে। আমি কিন্তু সে সব কিছু করব না। আমার বাবা যে ভুল ক'রে গিয়েছেন সে ভুল আমাকে সংশোধন করতে হবে।

বলে তিনি চুপ করলেন। এত কথা একসঙ্গে বলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। সত্যবাবু বললেন, "থাক্, পরে শুনব। বেশী কথা কওয়া তোমার পক্ষে ভাল নয়।"

হরিধন—না, এখনি বলি। পরে হয়ত মোটেই বলতে পারব না।

আস্তে আস্তেই বলি, মন দিয়ে শোন। তুমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমাদের অনেক কথাই জান। কৃষ্ণধন নামে আমার একটি ছোট ভাই ছিল। আমাদের দু ভাইয়ে ভারি ভাব ছিল। আমার রং ময়লা, কিন্তু সে ছিল ফর্সা। আমার পড়বার ঘরে টেবিলের উপর তার একখানা 'ফটো' আছে, সেখানা তুমি নিও। কৃষ্ণধনের কপালের বাঁ দিকে চুলের নীচে, একটা মস্ত লম্বামত কালো তিল ছিল; সেটাকে ঢাকবার জন্য সে সামনের চুল একটু লম্বা রাখত। তাতে তাকে দেখাত ভালই। আমাদের বাবা রাগী স্বভাবের ছিলেন। আমাদের যেমন ভাল বাসতেন, তেমনি শাসনও করতেন খুব। কেষ্ট বাবার রাগ পেয়েছিল। আমরা দুজনে যখন কলেজে পড়ি, তখন একটা কি নিয়ে বাবার সঙ্গে তার তর্ক হয়। বাবা কি রকম নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন জানই তো। আচার-বিচারের সামান্য একটা বিষয় নিয়ে তর্ক ওঠে। শেষকালে এমন দাঁড়াল যে বাবা কেষ্টকে খড়ম দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিলেন, আর বললেন, "তুই যা, আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা। এমন কুপুত্রের মুখ দেখতে চাই না।" সে অমনি বেরিয়ে চলে গেল। তার তখন স্নান হয়নি, খাওয়া হয় নি। বাবার কথার নড়্‌চড়্‌ হবার যো ছিল না; একবার মুখ দিয়ে যা বেরোবে, তা আর ফিরবে না। সত্যি সত্যিই তিনি আর তার মুখ দেখলেন না, যদিও ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর মনে কষ্টের সীমা ছিল না। মা কত কান্নাকাটি করতেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর মন টলাতে পারেন নি। বাবা আমাদের হুকুম দিয়ে দিয়েছিলেন, কেউ তার খবর নেবার কোনও চেষ্টা করবে না। বাবা মারা যাবার পর, আমি অনেক খোঁজ করেছি, তার কোনও সন্ধান পাই নি। সে যে অভিমানী ছেলে, সে কি আর ধরা দেবে?

তার জন্য শোকই মাকে মৃত্যুশয্যার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

আমার আর বেশী কিছু বলবার নেই। কৃষ্ণধনকেই আমার সব সম্পত্তি দিয়ে যাচ্ছি। তার অবর্তমানে, তার ছেলে কি মেয়ে যারা থাকবে, তারা পাবে। যদি তাকে না পাওয়া যায়, কিম্বা তার ছেলেমেয়ে না থাকে, তবে এ টাকা দিয়ে কৃষ্ণধনের নামে একটা 'ফ্রী' স্কুল খোলা হবে।

হ্যাঁ, ভজু এক হাজার টাকা পাবে।

ধীরে ধীরে থেমে থেমে হরিধন এই কথাগুলি বললেন। এতদিন ধ'রে এত চেষ্টা ক'রে যার কোনও সন্ধান্ পাওয়া যায় নি, তাকে খুঁজে বের করা কঠিন বটে। তবু সত্যবাবু প্রাণপণ চেষ্টা করতে প্রতিশ্রুত হলেন। উইল লেখা হল।

হরিধন বাবুর মৃত্যুর পর, তাঁর জন্য প্রকৃত শোক করবার লোক ছিল দুটি,—এক সত্যবাবু আর ভজহরি। বিষয়সম্পত্তি কাগজ-পত্র সব ঠিক ক'রে গুছিয়ে নেবার জন্য, সত্যবাবু কয়দিন প্রায় এ বাড়ীতেই রইলেন। ভজহরি খাওয়া-দাওয়া একরকম ছেড়ে দিয়েছে। এক সন্ধ্যাবেলা সে এসে সত্যবাবুকে বলল, "এখানে আমার মন টিকছে না। আমি কিছুদিন তীর্থে ঘুরে আসতে চাই।" এই বলে, পোঁটলা-পাঁটলা বেঁধে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

হরিধনের প্রকাণ্ড বাড়ী এখন তালা বন্ধ। দ্বারবান আর দু-তিন জন চাকর আছে। মাঝে মাঝে দরজা জানালা খুলে ঘরগুলি পরিষ্কার করে তারা। সত্যবাবু কখন কখন এসে দেখে যান। তিনি কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, কিন্তু কৃষ্ণধনের খবর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তবু তিনি নিরাশ হন নি। যত রকমে সম্ভব খোঁজ নিচ্ছেন। এক-এক বার তাঁর মন দমে যাচ্ছে, ভাবছেন, 'হয়ত সে বেঁচে নেই।'

দুই

ঘুরে ঘুরে ভজহরি গয়াতে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে তার দূর সম্পর্কের ভাই রামসুন্দর থাকত। ভজু তার বাড়ীতে উঠল। অনেক দিন পর ভজুকে পেয়ে রামসুন্দর খুব খুশি। কিন্তু সে সময়ে গয়াতে বসন্ত রোগ আরম্ভ হয়েছে; তাই রাম বলল, "ভজু, তুমি এ সময়ে না এসে, আরও মাস কয়েক পরে এলে ভাল করতে।"

ভজু উত্তর করল, "বসন্ত আমার কিছু করবে না। তা ছাড়া, মনিবই যখন চলে গেলেন, আমিই বা আর থেকে কি করব ?"

দুজনে অনেক গল্প হল। হরিধন বসুর কথা, তাঁর টাকাকড়ির কথা, উইলের বিষয়ে সমস্ত রাম শুনল। শুনে বলল, "দেখ, বিদেশে থাকি, দেশের মানুষ একটি দেখলে কত আনন্দ হয়। তুমি এতদিন পরে এলে, তোমাকে পেয়ে মনটা কেমন খুশি লাগছে। আর আপন ভাই, রক্তের সম্বন্ধ, তাকে টাকা দেবেন না তো কাকে দেবেন ? আহা, কৃষ্ণধন বাবু কোথায় কেমন যেন আছেন! বেঁচে আছেন কি না, তাই বা কে জানে।"

রাত্রে রামের একটু জ্বর হল। ভজহরি জিজ্ঞাসা করল, "কাছে কোনও ডাক্তারখানা আছে কি ? তা হলে কিছু ওষুধ নিয়ে আসি।" রাম বলল, "না, ওষুধ কি দরকার ? আমার অমন মাঝে মাঝে জ্বর হয়ে থাকে ? কাল সকালে ছেড়ে যাবে।"

"তবু, যে দিনকাল, তাতে সাবধান থাকা ভাল।" বললে ভজহরি।

সকালে কিন্তু রামের জ্বর ছাড়ল না, বরং বাড়লই। তার বাড়ীর

গলির মোড়ের উপর অতুলবাবুর ডাক্তারখানা। ভজহরি সেখানে গেল ওষুধ আনতে। ডাক্তারবাবু তখনও ভেতর বাড়ী থেকে বেরোন নি। সে তাঁর জন্য অপেক্ষা করল। তাঁর অফিসঘরের সামনের বারান্দায় আরও আট-দশ জন লোক বসে আছে। সেই বারান্দার দেওয়ালে কতকগুলি ছবি, মাসপঞ্জী, ওষুধের বিজ্ঞাপন এই-সব টাঙান রয়েছে। ভজহরি পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে সেগুলি দেখছে। হঠাৎ একটা ছবিতে তার নজর পড়ল, একখানা ফটোগ্রাফ; সে মন দিয়ে দেখতে লাগল। ছবিখানাতে কয়েকজন ভদ্রলোক একটা বাগানে বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের চেহারা দেখে সে চমকে উঠল। এ যে ঠিক ছোটবাবু কৃষ্ণধনের মত চেহারা! ভজু হরিধন বসুর বাবার আমলের চাকর, অল্প বয়স থেকে তাঁদের বাড়ীতে মানুষ। হরিধন কৃষ্ণধন সকলকেই ছোটবেলা হতে দেখেছে। কৃষ্ণধন যখন বাড়ী ছেড়ে যায়, তখন কলেজে ঢুকেছে সে। এ ছবিখানা একটু বেশী বয়সের, কিন্তু তবু ভজুর খুব বিশ্বাস হল যে, ছবি কৃষ্ণধনেরই।

ঠিক সেই সময় অতুলবাবু এসে পড়লেন। যারা অপেক্ষা করছিল, তারা সকলে একে একে তাঁর কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে চলে গেল। এবার ভজুর পালা। সে রামের জন্য ওষুধ নিয়ে, ডাক্তার বাবুকে বলল হাত জোড় করে, "হুজুরের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।" অতুলবাবু মানুষ খুব ভাল। তাঁর ডাক্তারখানা থেকে গরীবদের বিনা পয়সায় ওষুধ দেওয়া হত। কেবল ওষুধ নয়, অনেক সময়ে দরকার পড়লে তিনি পথ্যাদিরও ব্যবস্থা করতেন। এসব ভজু শুনেছিল, তাই সাহস পেয়ে, সে তাঁর চাকরবাকরকে জিজ্ঞাসা

না করে, ছবির বিষয় তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবে ঠিক করেছিল। "কি কথা ?" ব'লে অতুলবাবু যখন প্রশ্ন করলেন, ভজু বলল, "সে অনেক। এখানে এখন হবে না। অন্য কোন সময়ে যদি হুজুরের সুবিধা হয়, তবে দেখা করতে পারি।" "আচ্ছা, আজ সন্ধ্যার পরে তুমি এখানে আমার সঙ্গে দেখা কর।" অতুলবাবু বললেন তাকে। তিনি ভাবলেন, হয়ত গরীব, খেতে পায় না. ভিক্ষা চায়।

সন্ধ্যার আগেই ভজহরি ডাক্তারখানায় উপস্থিত হল। সে ছবিখানা যতই ছাখে ততই তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে,—এ ছোটবাবু ছাড়া আর কেউ নয়। অতুলবাবু তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, আর তার চার পাশে কতগুলি চেয়ার ও টুল ছিল। টেবিলের উপরে বড় একটা ল্যাম্প এর মধ্যেই লাগানো হয়েছে। এক কোণে সরু তক্তপোষের উপর বিছানা পাতা; তার কাছে ছোট তেপায়ার উপর কিছু যন্ত্রপাতি। এই ঘরে তিনি রোগী দেখেন ও পরীক্ষা করেন। ঘরের বাতাসে কেমন যেন ওষুধ ওষুধ গন্ধ।

ভজুই প্রথমে কথা আরম্ভ করল, "আমি কলকাতা থেকে আসছি। আমার নাম ভজহরি। কলকাতায় আমার মনিব, বাবু হরিধন বসু, কিছুকাল হল মারা গিয়েছেন।" তারপর হরিধনের অনেক প্রশংসা করে, ভজু তাঁর উইলের বিষয় বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলল, "আপনার বারান্দায় একখানা ছবি টাঙানো আছে, আমার কেবলই মনে হচ্ছে, তাতে যেন ছোটবাবুর চেহারা আছে।"

অতুলবাবু এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, "কই সে ছবি ? চল তো, দেখাও।" ভজু তাঁকে বারান্দায়

নিয়ে গিয়ে ছবিখানা দেখাল আর বলল, "এতে তো আপনার ছবিও আছে। আপনি তা হলে এঁকে চেনেন?"

অতুলবাবু খানিকক্ষণ ধরে একবার ছবির দিকে, একবার ভজুর দিকে চাইলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ঠিক জান চেহারা তোমাদের ছোটবাবুর মত?

ভজু উত্তর করল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তাঁকে ছোটবেলা থেকে দেখছি।"

অতুলবাবু—তাঁর নাম না ছিল কৃষ্ণধন বসু? আমার এ বন্ধুটির নাম বাসুদেব বসু।

ভজু—বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এসেছিলেন, পরে কোন রকম খবরও দেন নি; নাম বদলান আশ্চর্য কি?

অতুলবাবু—আশ্চর্য কিছুই নয়। আচ্ছা তোমাদের সত্যবাবুর সঙ্গে একবার আমার দেখা করাতে পার?

ভজু—তাঁকে বললে, তাঁর যদি অবসর থাকে তিনি নিশ্চয় আসবেন বলে আমার বিশ্বাস। আজ্ঞে, ছোটবাবু এখন কোথায় আছেন? আমি তাঁকে দেখতে যাব।

অতুলবাবু—তিনি এখন কোথায় আছেন আমি জানি না। অনেক দিন হল এখান থেকে চলে গেছেন। যাই হোক, আমি এখন বেরোচ্ছি। তুমি এক কাজ কর, কাল সকালে এসে আমার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে যাও সত্যবাবুর কাছে। পারবে তো? তিনি কলকাতায় আছেন তো?

ভজু—আজ্ঞে আমি খুব পারব যেতে। কলকাতায় থাকুন, যেখানে থাকুন, আমি তাঁর কাছে চিঠি নিয়ে যাব।

তিন

কলকাতায় এসে ভজহরি স্টেশন থেকে সোজা গেল সত্যবাবুর বাড়ী। তিনি তখন সবে চা খাওয়া শেষ করেছেন। ভজহরি তাঁর হাতে অতুলবাবুর চিঠি দিল। চিঠি খুলে প'ড়ে তিনি দু'চার কথা জিজ্ঞাসা করবার পর বললেন, "আজই আমি গয়া যাব।" ভজু হাত জোড় করে বলল, "আজ্ঞে, আমিও যাব আপনার সঙ্গে।"

সত্যবাবু—যাবে? তা চল। সুবিধাই হবে সেটা।

গয়াতে গিয়ে সত্যবাবু অতুলবাবুর বাড়ীতেই উঠলেন। দুজনে অনেক কথাবার্তা হল। অতুলবাবু বললেন, "স্বভাব চাপা ছিল, সহজে কাউকে কোনো কিছু জানাতে চাইত না। আমি অনেক সময়ে তাকে তার মা-বাবার কথা, বাড়ীঘরের কথা জিজ্ঞাসা করেছি। সে খালি বলেছে 'ও-সব আমায় জিজ্ঞাসা ক'র না, ও আলোচনা আমার ভাল লাগে না।' তবে আমি এইটুকু বুঝেছিলাম যে, কোনও বিশেষ কারণে সে তার বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না। অথচ বাড়ী ফিরে যেতে মনে মনে খুব ইচ্ছা। এখানে সে একটা দোকান দিয়েছিল, তাইতেই তার খাওয়া-পরা চ'লে যেত। কোনও রকম বাবুগিরি তো ছিল না, সামান্য ভাবে থাকতেই ভালবাসত। একবার তার অসুখ করে, আমি দেখতে যাই। সেই থেকে আমাদের মধ্যে ভাব হয়ে যায়।

বাসু বরাবরই একটু খেয়ালী-গোছ ছিল। হঠাৎ একদিন এসে বলল, 'এখানে আমার ভাল লাগছে না, আমি দেশ বেড়াতে যাব।' যে কথা সেই কাজ। দুদিন পরেই এখানকার পাট উঠিয়ে সে চলে

গেল। আর তার সঙ্গে দেখা হয় নি। মাঝে মাঝে চিঠি লিখত। এলাহাবাদ থেকে একবার লিখেছিল, তাতে লিখেছিল বিয়ে করেছে ব'লে। তারপর মুঙ্গের থেকে তার চিঠি পাই, সেই তার শেষ চিঠি। আর তার কোনো খবর পাই নি। মুঙ্গেরের ঠিকানাটা আপনাকে দেব।"

হরিধন তাঁর ভাইয়ের যে ছবি সত্যবাবুকে দিয়েছিলেন, সেখানা তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। অতুলবাবুর বারান্দায় যে ছবি ছিল, তার সঙ্গে সেখানা মিলিয়ে দেখা গেল, আশ্চর্য সাদৃশ্য। এক লোকের ছবি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। খানিক বাদে সত্যবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তার শরীরের কোথাও বিশেষ কোনও চিহ্ন দেখেছিলেন কি?"

অতুলবাবু প্রথমে বললেন, "কই, না তো।" কিন্তু তার পরেই বললেন "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো ভুলেই যাচ্ছিলাম। একদিন বাসু আমাকে বলছিল, 'তোমরা তো ডাক্তারিতে কত রকম কর; মানুষের গায়ের তিলের দাগ তুলে দিতে পার কি?' 'আমি বললাম কেন বল দেখি।' তখন সে কপালের চুল সরিয়ে বলল, 'এটা তুলে দিতে পার?' 'দেখলাম ওর কপালের বাঁ দিকে চুলের লাগা, লম্বা-মত মস্ত একটা কালো তিল। বললাম, 'ওটা তো ঢাকাই আছে। মিছিমিছি দাগটা তুলতে গিয়ে আর একটা বিশ্রী দাগ করবে কেন?' ও আর কিছু বলল না।"

এই কথায় সত্যবাবু নিঃসন্দেহ হলেন। এখন তাঁর কর্তব্য মুঙ্গেরে গিয়ে কৃষ্ণধনের সন্ধান করা। তিনি পরদিনই কলকাতা রওনা হলেন। ভজুও তাঁর সঙ্গে চলল। সে এতদিন বাপের

বাড়ীতেই ছিল। রোজ এসে সত্যবাবুর সঙ্গে দেখা করত, খবর কি পেলেন না-পেলেন শুনত। অতুলবাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রে, কৃষ্ণধন যে বাড়ীতে থাকতেন সেই বাড়ীর ঠিকানা, তাঁর দোকান যেখানে ছিল সেই ঠিকানা, সব জেনে নিয়েছিল। শ্যামের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ভজু বাড়ী ও দোকানের রাস্তা খুঁজে বের করল। কিন্তু কত কালের কথা, এখন কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। দোকান যেখানে ছিল সেখানে এখন একটা ইস্কুল বসেছে। বাড়ীখানা আছে বটে, তার ইট খ'সে পড়েছে, দেয়াল নোনা ধরা; এখন আর সে বাড়ীতে কেউ বাস করে না। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ভজু পোড়ো বাড়ীর কাছ থেকে বিদায় নিল। তবু মনে আশা রইল, মুঙ্গেরে ছোটবাবুকে পাওয়া যাবে।

মুঙ্গেরে সত্যবাবু একাই গেলেন। খুঁজে খুঁজে তিনি অতুলবাবু যে ঠিকানা দিয়েছিলেন, সেই ঠিকানায় বাড়ীখানা পেলেন। কিন্তু বাড়ীর দরজায় তালা বন্ধ। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, কি করবেন ভাবছেন, এদিক ওদিক চাইছেন, এমন সময়ে পাশের বাড়ী থেকে কে জিজ্ঞাসা করল, "কাকে খুঁজছ?"

ফিরে দেখেন, রোয়াকে দাঁড়িয়ে ছোট একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করছে, "কাকে খুঁজছ?" সত্যবাবু তাকে বললেন, "খুকি, তুমি বলতে পার, এ বাড়ীতে বাবু বাসুদেব বসু থাকেন কি না?" মেয়েটি উত্তর দিল, "বাসু কাকা তো সগ্গে গেছে।"

এই খবর শুনে সত্যবাবুর কেমন লাগল তা সহজেই অনুমান করতে পারা যায়। তিনি মাথায় হাত দিয়ে রোয়াকের উপর বসে পড়লেন। তাঁর এত পরিশ্রম সব বৃথা হল। হতাশায় স্তব্ধ হয়ে

খানিক ব'সে থাকবার পরে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল,—সে তো বিয়ে করেছিল। ছেলেমেয়ে যদি থেকে থাকে? স্ত্রী কোথায় তাও তো জানতে হয়। মেয়েটিকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের বাড়ীতে কে আছেন?"

মেয়েটি বাড়ীর ভিতর থেকে 'মানি, মানি' ডাক শুনে "বাবা আছেন—" বলতে বলতে চলে গেল। সত্যবাবু ঠিক করলেন মানির বাবার সঙ্গে দেখা করবেন।

মানির বাবা অমর বাবুর কাছ থেকে তিনি যা সংগ্রহ করলেন, তা এই।

বছর দুই আগে, বাসুদেব নতুন বিয়ে ক'রে এসে তাঁদের পাশের বাড়ীতে ওঠে। মুঙ্গেরে সে আগে আর আসে নি। জায়গাটি তার খুব ভাল লাগে। কাছেই গঙ্গা নদী, বাড়ীর জানালা থেকে দেখা যায়। তাই সেখানেই থাকবে ঠিক ক'রে দোকানপাট খুলে বসে। সে বছর আষাঢ় মাসে মুঙ্গেরে দারুণ কলেরা লাগে। বাসুদেবের কলেরা হল, তাকে বাঁচানো গেল না। তখন তাঁর ছোট্ট ছেলেকে—মুঙ্গেরেই জন্মায় ছেলেটি—ও স্ত্রী বাণীকে মানির মা নিজের কাছে নিয়ে এলেন। আনবার রাত্রেই বাণীও সেই রোগে আক্রান্ত হল, এবং মারা গেল।

ছোট ছেলেটিকে তাঁরাই মানুষ করতে লাগলেন। বাসুদেবের আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই জানতেন না। তার স্ত্রীরও বোধ হয় বাড়ীতে এক দূর সম্পর্কের কাকা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না; তাঁরা বড় খবর নিতেন না। কেবল তার এক পিসতুতো বোন বিরজা, ওড়িশা থেকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন। মানির মা সে

কথা বাসুদেবের স্ত্রীর কাছে শুনেছিলেন। খুঁজেপেতে সেই বোনের চিঠি পাওয়া যায়, ঠিকানা মেলে। তখন বাসুবাবুর স্ত্রীর এই বোনকে মানির মা খবর দিলেন, অনুরোধ করলেন খোকাটিকে তাঁদের কাছে নিয়ে যেতে।

মানির বাবা বলতে লাগলেন, "বাসুদেবের শালি বিরজারও বিয়ে হয়েছিল। কিছুদিন পরে কটক থেকে চিঠি এল। বিরজার স্বামী চন্দ্রনাথবাবু লিখলেন, তিনি একটা কাজ নিয়ে পরদিনই কলকাতায় যাচ্ছেন, তাই নিজে খোকাকে মুঙ্গের থেকে আনতে যেতে পারবেন না, তবে বন্দোবস্ত করবেন। লিখেছিলেন, তাঁর পরিবার কটকেই আপাততঃ থাকবেন। কলকাতার ঠিকানাও দিয়ে ছিলেন। এর মধ্যে আমরা শুনলাম, আমাদের পাড়ার গোপালবাবু সপরিবারে পুরী যাবেন। চন্দ্রবাবুকে লিখে, আমরা তাঁদের সঙ্গেই খোকাটিকে কটকে পাঠিয়ে দিলাম।

ভাল কথা,—খোকাটিকে যখন আমরা আমাদের বাড়ীতে আনি, তখন সরু সোনার হার ছিল ওর গলায়, তাতে একটি লকেট লাগানো ছিল। লকেটটি খুলে দেখলাম, ভিতরে একদিকে তার বাবার ছবি, এক দিকে মায়ের ছবি। হারটি তার সঙ্গেই দিয়ে দিয়েছি।"

কলকাতায় ফিরে, সন্ধান ক'রে, সত্যবাবু চন্দ্রনাথের বাড়ী পৌঁছলেন। চন্দ্রনাথ বাড়ীতেই ছিলেন তিনি এসে সত্যবাবুকে ঘরে ডেকে নিয়ে বসালেন। আলাপ-পরিচয় হল। তারপর সত্যবাবু হরিধনের উইলের কথা পাড়লেন। তাঁর মরাতে এবং মুঙ্গেরে যাওয়ার কথা, মানির বাবার কাছে যা শুনেছিলেন, সে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনালেন।

শুনে চন্দ্রনাথ বললেন, "মাস দুই আগে আমি যখন কটকে, মুঙ্গের থেকে অমরবাবুর চিঠি পাই। বাসুদেব ও তার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ তিনি দিয়েছিলেন; আর লিখেছিলেন, একটি ছোট শিশু আছে বাসুদেবের, এক মাসের, তাকে অমরবাবু এনেছেন নিজের বাড়ীতে। আমাদের ছাড়া অন্য কোনও আত্মীয়ের খবর তাঁরা পাচ্ছেন না, অতএব আমি যেন খোকাটিকে নিয়ে আসি। তারপর তাঁরা তাঁদের পরিচিত কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে বাসুদেবের ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন কটকে, খবর পেয়েছি।"

সত্যবাবু—আপনি কি বাসুকে, মানে কৃষ্ণধনকে, চিনতেন?

চন্দ্রনাথ—তাকে আমি দেখি নি কখনও। নাম শুনেছিলাম মাত্র। আমার স্ত্রীর এক দূর সম্পর্কীয় মামা এলাহাবাদে থাকতেন, তাঁর মেয়েকে বিয়ে করে ছিলেন বাসুদেব। বিয়ের নিমন্ত্রণ আমরা পেয়েছিলাম। তবে, অতদূরে যাবার সুবিধা হয় নি।

সত্যবাবু—আপনি বুঝি কটকেই থাকতেন?

চন্দ্রনাথ—উড়িষ্যায় ছিলাম। আমার শ্বশুরবাড়ী কটকে। বাসুদেবের বিয়ের আগের বছর আমার বিয়ে হয়। শ্বশুর মশাই সেখানে চালের ব্যবসা করতেন। তিনি মারা যাবার পর, তাঁর ছেলে কালিদাস, আমার শালা, ব্যবসা চালাত। কিন্তু সে ছেলেমানুষ, লোকে তাকে ঠকাতে থাকে। সেইজন্য শাশুড়ী-ঠাকরুণ অনুরোধ করলেন আমায়, কটকে থেকে ব্যবসাটা চালাতে। কিন্তু চাল ঘাটাঘাটি ক'রে আমার বিরক্তি ধ'রে গেল। তাই আমি কলকাতায় চাকরীর জন্য চেষ্টা ক'রে এখানে এসেছি। তবে আমার পরিবার এখনও আসেন নি, কটকেই আছেন। গত মাসে আমাদের একটি

ছেলে হয়েছে। তাদের আর চার পাঁচ মাস পরে নিয়ে আসব ভাবছি। পথ তো সোজা নয়। রেল নেই ওদিকে। চাঁদবালি বন্দর থেকে উঠে, সমুদ্র দিয়ে এসে কলকাতায় আর্মানিঘাটে নামতে হয়।

সত্যবাবু—সেই ক'রে আনাই ভাল। ছোট ছোট দুটি ছেলে নিয়ে আসা। আপনি বুঝি যাবেন ওঁদের আনতে?

চন্দ্রনাথ—না, আমি আর যাব না। নতুন কাজ নিয়েছি। অবিনাশই আনবে। আমার স্ত্রী আসবেন তো, কাজেই অসুবিধা হবে না খোকাদের।

সত্যবাবু—বেশ। তবে আমি আজ যাই। আবার কয়েক মাস পরে এসে খবর নেব।

কিন্তু চার-পাঁচ মাস পরেও চন্দ্রনাথের স্ত্রী বিরজার নানা কারণে ছেলেদের নিয়ে কলকাতায় আসা হল না। কখনও অবিনাশের অসুবিধা, কখনও ছেলেদের কারও শরীর খারাপ, কখনও বা আর কিছু। চন্দ্রনাথের শাশুড়ী নাতির নাম রেখেছিলেন 'সুনীল', ডাকতেন 'গোপাল' বলে। অন্য ছেলেটিরও সেই সঙ্গে নাম হয়েছিল 'সুশীল'।

চার

সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়েছে; বিরজা যাবে কলকাতায় খোকা দুটিকে নিয়ে, সঙ্গে যাবে তার ভাই। কিন্তু রওনা হবার দুদিন আগে ভাইয়ের জ্বর এল খুব; মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা, মাথা তুলতে পারে না।

কি করা যায় ? বার বার যাত্রা পিছিয়ে যাওয়াতে বিরজার মন ভেঙে গেছে। হঠাৎ একটা বাধা পড়াতে মায়ের মনটাও খুঁৎ খুঁৎ করছে, তিনি বলছেন,—দুদিন পরে গেলে চলবে। কিন্তু বিরজা জিদ্ ধরেছে, সে একাই যেতে পারবে একজন ঝি-টি কাউকে পাওয়া গেলে। ওদিকে গিয়ে নামলে তো চন্দ্রনাথই এসে নিয়ে যাবেন বাড়ী, কেবল জাহাজের তিনটা দিন কাটানো।

অবশেষে অবিনাশ বলল, "কেদ্রোপাড়ায় যাঁরা নতুন চালের আড়ত খুলেছেন, তাঁদের একজন কর্মচারীর ঐ জাহাজে কলকাতা যাবার কথা আছে, তাদের কাছে খবর নিলে হয়।" তাই করা হল। জানা গেল, সেই কর্মচারী যদুনাথ তার স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় তার শ্বশুরবাড়ীতে যাচ্ছে, বিরজার যে জাহাজে যাবার বন্দোবস্ত হয়েছে, সেই জাহাজেই। বিরজা তখন আর কোনও আপত্তি শুনল না, এদের সঙ্গে যাওয়া ঠিক ক'রে ফেলল।

চাঁদবালি বন্দরে জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। মস্ত বড় উঁচু জাহাজ। সিঁড়ি বেয়ে উপরে 'ডেকে' উঠতে হয়। সমুদ্রের নীল জল ঢেউ তুলে নাচছে। কত লোক উঠছে জাহাজে, কত মালপত্র! জাহাজেরই লোক না কত। সবাই কাজে ব্যস্ত, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি চলেছে। যদুনাথ বিরজাকে আর ছেলে দুটিকে জাহাজের একটা কামরায় বসিয়ে দিল। নিজের বৌকেও রাখল সেখানে।

সমুদ্র দেখা, [illegible] খাওয়া, গল্প করা, আর ছেলে দুটিকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে দিন কাটে।

[illegible] যদু বিরজার সামনে বড় যায় না, কাছাকাছি থাকে, খবর নেয়। গ্রীষ্মকাল, কামরার ভিতরে গরম লাগে, তাই

তাদের অভয় দিলেন—নদীর মুখের কাছে এসেছি, সকালেই কলকাতা পৌঁছে যাব, ঝড়ও থেমে যাবে ততক্ষণে।

কিন্তু ঝড় থামল না, বরং বেড়েই চলল ক্রমাগত। জাহাজখানাকে এগোনো যাচ্ছে না, সামলানো দায় হয়েছে। প্রচণ্ড বাতাসে সমুদ্রের ঢেউ উঁচু হয়ে আছড়িয়ে পড়ছে ডেকের উপর। জাহাজখানাকে ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে যেন। জিনিসপত্র গড়াচ্ছে গড়্‌গড়্‌ শব্দে। কালো মেঘ চিরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তারপর কড়াকড় শব্দে বাজ, যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। যাত্রীরা ভয়ে জড়োসড়ো।

পুরনো জাহাজ, নদীর মুখের কাছে আসতে জলের তোড়ে তার নীচের কাঠ একখানা ফাঁক হয়ে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে জল উঠতে লাগল জাহাজের খোলে। ক্রমে বোঝা গেল আস্তে আস্তে জাহাজ ডুবছে। তখন তার সাইরেন বাঁশী ডাক ছাড়ল ভীষণ জোরে—ভোঁ ভোঁ করে। বাঁশী তো নয়—যেন দানবে শাঁখ বাজাচ্ছে। সাইরেন সমানে বেজেই চলেছে। যাত্রীরা কেউ হরিনাম জপছে, কেউ কাঁদছে। মাঝে মাঝে নীচের লোকেরা এক সঙ্গে জড়ো হচ্ছে। সকলেই দিশেহারা হয়ে গেছে ভয়ে।

বড়বৌ ছেলেমেয়েদের বুকে নিয়েছে, মেজ বৌ নিয়েছে সুশীলাকে। মধু একবার খালাসীদের কাছে গিয়ে খবর নিচ্ছে, একবার ছুটে আসছে নিজেদের কাছে।

সাইরেনের গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল বহু দূর পর্যন্ত। সেইখানে পাড়ে কতগুলি নৌকো বাঁধা ছিল। কয়েকজন মাঝি, সাইরেন শুনে, ছুটে এসে নৌকোর দড়ি খুলতে লাগল। কেউ ছুটল অন্য মাঝিদের খবর দিতে। এই ঝড়ে নৌকো চালানো অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ।

কিন্তু জাহাজ বিপন্ন—যাত্রীদের বাঁচাতেই হবে। ঝড় তুফান ভেদ ক'রে চলল নৌকোগুলি।

যাত্রীরাও আশায় উদ্বেগে চেয়ে রয়েছে নৌকোগুলির দিকে। পাঁচ-ছয়খানা নৌকো এসে পৌঁছতেই, লেগে গেল হুড়োহুড়ি—কে আগে যাবে। মাঝিরা অতি কষ্টে আর সকলকে বাধা দিয়ে, ছোট ছেলেদের আর স্ত্রীলোকদের তুলে নিতে লাগল প্রথমে। জাহাজের উপর থেকে মোটা দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হয়েছে নীচে। জাহাজ দুলছে, সিঁড়ি দুলছে, নৌকোও দুলছে ভীষণ। মন্টুর বৌ আগে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। খালাসী একজন নামিয়ে দিল সুশীলকে। তারপর বিরজা নামবে। সে ভয় পেল, তার পা কাঁপতে লাগল। এই দেখে, তার পাশে যে একজন ছিল, সে তার কোল থেকে নিল খোকাকে। বিরজা অতি কষ্টে সিঁড়ি বেয়ে নামল। এক নৌকো বোঝাই হয়ে গেলে রওনা দেয়, অন্য নৌকো এগিয়ে আসে। গণ্ডগোল আর হুটোপাটিতে কে যে কোনটাতে উঠল, ঠিক ঠিকানা রইল না।

পরদিন কলকাতার ঘাটে অনেক লোকের ভীড়। জাহাজ এসে পৌঁছয় নি। এমন তুফান গেছে রাতে, কি হল কে জানে। বিকালের দিকে দেখা গেল, পাঁচ-ছয়খানা যাত্রীবোঝাই নৌকো আসছে ঘাটের পানে। চন্দ্রনাথও গিয়েছেন জাহাজ ঘাটে। যাত্রীদের নৌকোয় আসতে দেখে সকলেরই আশঙ্কা হল জাহাজ ডুবে গেছে। যাঁদের আত্মীয়স্বজন আসবার ছিল, তাঁরা মনের কি ভয়ানক অবস্থায় যে অপেক্ষা করতে লাগলেন, তা তাঁরাই জানেন।

নৌকোগুলি এসে ঘাটে লাগল। একে একে যাত্রীরা নামল ডাঙায়। চন্দ্রনাথ দুরু দুরু বুকে এগিয়ে গেলেন—এ নৌকো

দেখলেন, ও নৌকো দেখলেন, বিরজাকে পেলেন না। ভীড়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে বেড়ালেন, সেখানেও তাকে বা ছেলেদের পেলেন না। শেষে দূর থেকে এক জায়গায় দেখলেন, একজন লোক কোট জড়ানো একটা পোঁটলা নিয়ে ব'সে আছে, আর হাহাকার ক'রে কাঁদছে। চন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে দেখলেন, লোকটির কোলে একটি ছোট ছেলে। যদু তার গায়ের কোটখানা জড়িয়ে দিয়েছিল খোকাটির গায়ে, বাতাস ও জলের ঝাপটা লাগবে না ব'লে। যদু তখনও কাঁদছে, চন্দ্রনাথকে দেখতে পায় নি। চন্দ্রনাথের বুকের ভিতরটা তোলপাড় করছে। তিনি তার কাঁধ ধ'রে ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন কাঁদছ তুমি? এ ছেলে কার? আর-সব কোথায়?"

কাঁদতে কাঁদতেই বলল যদু, "চন্দর বাবুকে চাই। আমি আর আমার স্ত্রী কলকাতায় আসছিলুম। সঙ্গে কটক থেকে মা-ঠাকরুণ এলেন, দুটি ছেলে নিয়ে। এই নদীর মুখে জাহাজ ভেঙে গেল। নৌকোয় উঠলুম সবাই। গোলমালে তারা উঠল এক নৌকোয়, আমি এই ছেলেকে নিয়ে উঠলুম আর এক নৌকোয়।—তাঁদের নৌকো উল্টে গেল—"

"এঁ্যা! কি বলছ? ডুবে গেছে? এঁ্যা?" বলতে বলতে চন্দ্রনাথ মাটিতে ব'সে পড়লেন। তিনিও কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কতক্ষণ যে এইভাবে কাটল, খেয়াল রইল না কারও। এর মধ্যে খোকা কেঁদে উঠতে দুজনের সম্বিৎ ফিরে এল। চন্দ্রনাথ ছেলেকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "আর একটি খোকা ছিল না?" তাঁর মাথায় কেমন যেন গোলমাল লেগে গিয়েছিল, কিছুই বুঝতে পারছিলেন না—বিরজা আসে নি, খোকা একটি আসে নি।

যদু বলল, "এই একটি ছেলেই আমার কোলে ছিল। অন্যরা—" ব'লে আর তার কথা সরলো না, ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল।

কতক্ষণ অভিভূতের মত ব'সে থেকে, চন্দ্রনাথ খোকাটিকে নিয়ে উঠলেন, যদুকে বললেন, "তোমার আমার এক দশা। এখানে ব'সে থেকে কি হবে? আমি ছেলেকে নিয়ে বাড়ী যাই, ওর খিদে পেয়ে থাকবে। তুমিও চল আমার সঙ্গে।"

যদু—না। আমার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা এসে থাকবে, আমি তাদের সঙ্গেই যাব।

পাঁচ

বিপদ আসবে ব'লে চন্দ্রনাথ একজন হিন্দুস্থানী ঝি রেখেছিলেন, ছেলেদের দেখবে, কাজকর্ম করবে। সেদিন সকালে, খোকাদের জন্য দুধও আনিয়ে রেখেছিলেন। ছেলেটিকে কোলে নিয়ে তিনি বাড়ীতে ঢুকলেন স্বপ্নাবিষ্টের মত। তাঁকে দেখেই ঝি দৌড়ে এল। তিনি বললেন, "খোকার দুধ গরম ক'রে নিয়ে এস।" তারপর ঘরে গিয়ে খোকাকে বিছানার উপর বসিয়ে দিয়ে, নিজে শুয়ে পড়লেন তার পাশে। তাঁর যেন ভাববারও শক্তি চলে গেছে, সবই শূন্য বোধ হচ্ছে।

ঝি ছেলেটিকে দুধ খাইয়ে এনে, বাবুর পাশে বিছানায় শুইয়ে দিল। খোকা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিল, তাই তখনি ঘুমিয়ে পড়ল।

ক্রমে চন্দ্রনাথ একটু সামলালেন নিজেকে। প্রথমেই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, এই যে ছেলেটি বেঁচে এল, এ তাঁর ছেলেই তো? না কি

বাসুদেবের ছেলে? কেমন ক'রে নিশ্চয় জানবেন? যদুকেও সব জিজ্ঞাসা করবার কথা মনেও আসে নি। খোকার গায়ে ছিল নতুন নীল রঙের জামা; সেই জামার উপরে চক্‌চক্ করছিল সোনার হার ও লকেট। কি মনে ক'রে তিনি আস্তে আস্তে খুলে নিলেন হার। লকেটও খুলে ফেললেন; তার ভিতরে ছিল দুখানা 'ফটো' ছবি। চন্দ্রনাথ ভাবলেন,—ছবি দুখানা বাসুদেব ও তার স্ত্রীর ছবি নিশ্চয়,—ছেলের গলায় মা-বাবার ছবি থাকাই সম্ভব। তবে তো এটি বাসুর ছেলে সুশীলই। হায় হায়, বিরজা নেই, তাঁর গোপালও নেই। তিনি আবার শুয়ে পড়ে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগলেন।

খানিক পরে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল। জাহাজ-ডুবির খবর কলকাতা সহরময় ছড়িয়ে গিয়েছিল। সেই খবর পেয়ে সত্যবাবু ছুটে এসেছেন চন্দ্রনাথের কাছে। বাড়ীতে ঢুকে, কারও সাড়াশব্দ না পেয়ে, চিন্তিত মুখে ডাকলেন, "চন্দ্রবাবু বাড়ী আছেন?"

বিছানা ছেড়ে ধড়্‌মড়্ ক'রে উঠে এলেন। তাঁর চেহারা দেখে সত্যবাবু বুঝতেই পারলেন, সাংঘাতিক কাণ্ড কিছু ঘটেছে। জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলেন না। একটু পরে চন্দ্রনাথ নিজেই বললেন, "আমার সব গেছে। হা ভগবান—"

সত্যবাবু কী-ই-বা প্রবোধ দেবেন? করবারই-বা কি আছে? শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন খানিক। এই সময়ে ছেলের কান্না শোনা গেল। সত্যবাবু চমকিয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে কাঁদছে?"

চন্দ্রনাথ—ঐ খোকাটুকু নিয়ে এসেছে। আর কেউ নেই।

সত্যবাবু—আপনাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাই না। মানুষ কি আশ্বাস দেবে? একমাত্র ভগবানই শান্ত করতে পারেন। তিনিই

ভবদা। আমি আজ যাই, আবার আসব।

তখন চন্দ্রনাথ উঠে সেই বাক্স এনে তাঁর হাতে দিলেন।

চন্দ্রনাথ—লকেটটা খুলে দেখুন। কি মনে হয় বলুন?

লকেট খুলে দেখে বললেন সত্যবাবু, "এতে কৃষ্ণধনের ছবিই আছে দেখছি। অন্য ছবিটি বোধ হয় তাঁর স্ত্রীর। মুঙ্গেরের তাঁরা বলেছিলেন, বাসুদেবের ছেলের গলার হারের লকেটে ছেলের মা-বাবার ছবি ছিল।"

চন্দ্রনাথ—যে খোকাটি এসেছে তাহলে কৃষ্ণধনেরই ছেলে সে?

সত্যবাবু—তাই তো দেখা যাচ্ছে। খোকার নাম জানেন?

চন্দ্রনাথ—নাম তো আর ও নিজে বলতে পারে না। চিঠিতে লিখেছিল, বাসুদেবের ছেলের নাম দেওয়া হয়েছে 'সুশীল'।

সত্যবাবু—এমন ভয়ানক ব্যাপার যে ঘটে গেছে তা কল্পনাও করতে পারা যায় নি। আমি এমনিতেই আসতাম আজ আপনার কাছে। আমাকে একটা জরুরী 'কেস'এ মাদ্রাজে যেতে হচ্ছে কাল। সেখানে মাসখানেক থাকতে হবে। হরিধন বসুর বিষয়-সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারীর পাওয়ার ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। শীঘ্র করাই উচিত, এসব কাজে ফেলে রাখতে নেই। আমি মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে সমস্ত ব্যবস্থা করব।

চন্দ্রনাথ—সেই ভাল। এটা তো আমারও কর্তব্যের মধ্যে।

মাদ্রাজ থেকে ফিরে সত্যবাবু আবার এলেন চন্দ্রনাথের কাছে। তার পরদিনই নাবালক সুশীলের নামে, হরিধন বসুর সমস্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারী হিসাবে লেখাপড়া করা হল। সত্যবাবু বললেন, বিষয়-আশয় দেখাশোনা করবেন তিনি যতদিন না সুশীল সাবালক হয়। কিন্তু সুশীলের ভার, তার বাড়ীর কাজকর্মের ভার চন্দ্রনাথকে নিতে

চাইলেন। তাঁকে আরও অনুরোধ করলেন যে সুশীলের বড় বাড়ীতে অর্থাৎ হরিহর বসুর বাড়ীতে তিনি সুশীলকে নিয়ে বাস করুন, তার অভিভাবক হয়ে থাকুন। এও বললেন, এই কাজে চন্দ্রনাথকে সময় দিতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, অতএব তাঁকে সেজন্য মাসে মাসে কিছু টাকা দেবার ব্যবস্থা করবেন সত্যবাবু।

প্রথমতঃ চন্দ্র রাজি হলেন না, বললেন, "আপন লোকের দেখা-শোনা করব, সে আর বেশী কথা কি? কিন্তু তার জন্য টাকা নেব কেন?"

সত্যবাবু—আপন হোক, পর হোক, পারিশ্রমিক কিছু আপনাকে নিতেই হবে। না নিলে অত্যন্ত দুঃখিত হব আমি। আপনার অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়। কিছু যদি এতে সাহায্য হয় আপনার খুবই খুশি হব। আপনি 'না' বলবেন না। সব দিকেই এতে মঙ্গল।

চন্দ্রনাথ আর আপত্তি করতে পারলেন না। অল্প দিনের ভিতরেই তিনি সুশীলকে নিয়ে হরিহর বসুর বাড়ীতে উঠে এলেন। সুশীলের তত্ত্বাবধানের জন্য সরমা নামে একটি গরীব গৃহস্থঘরের স্ত্রীলোক নিয়োগ করা হল। হিন্দুস্থানী ঝিও আছে। সে বাড়ীর কাজ-কর্ম করে। পুরনো চাকর দুজন আছে। নতুন দারোয়ান একজন রাখা হয়েছে। পুরনো যে ছিল, সে বৃদ্ধ বয়সে অবসর নিয়ে চলে গেছে। এরা সকলেই চন্দ্রনাথের অধীনে রইল।

সুখ আসুক দুঃখ আসুক মানুষ তার কাজকর্ম বন্ধ রাখতে পারে না। চন্দ্রনাথ মনের শোক মনে চেপে, অফিসের কাজ ও বাড়ীর তদারক করেন। সুশীলকে আদরযত্ন করেন খুব। কোনও অসুবিধা তার হতে দেন না। তাঁর হৃদয় স্নেহপ্রবণ তাই ছেলেটিকে খুবই ভাল-

থেমেছিলেন। খোকাও তাঁকে দেখলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। চন্দ্রনাথ নিজের মনে ভাবতেন, 'আমার কেউ নেই সংসারে, এরও কেউ নেই,— মা নেই, বাবা নেই, আপনার বলতে কেউ নেই। অসহায় শিশু। আহা বেচারা!' এই সমবেদনা দুজনকে আরও কাছে টেনেছিল।

ছয়

নদীর ঘাটে যদু বলেছিল বটে, সে তার শ্বশুরবাড়ীর লোকদের সঙ্গে যাবে, কিন্তু তারা এসে যদুকে কিছুতেই সেখান থেকে ওঠাতে পারে নি। সে খালি বলে, "আরও নৌকো আসবে, সেগুলি দেখে তবে —।" কাজেই তাদেরও ঘাটের উপর অপেক্ষা করতে হল। তাদেরও তো খেয়ে এসে পৌঁছয় নি। একজন গিয়ে কিছু খাবার কিনে আনল। যদু খাবার মুখে দিল না। আরও দু-চারজন সেখানে অপেক্ষা করছিল, তাদেরও কেউ কেউ আসে নি।

সন্ধ্যা যখন হয়-হয়, তখন সাঁই সহিহাটি আর দুখানা নৌকো এসে ঘাটে লাগল। সবাই ছুটে গেল কাছে। মাঝিরা ধরাধরি করে কয়েকজন মানুষকে তীরে নামাল। সকলেরই প্রায় মরোমরো অবস্থা। এদের ভিতর যদুর বৌ আর অন্য লোকটি ছিল। পরে যে নৌকো-গুলি বেরিয়েছিল, সেগুলির মাঝিরা জল থেকে তুলেছিল কতকজনকে। দিবাকর খোঁজ তারা পায় নি।

যাদের উদ্ধার করে আনা হয়েছিল, তাদের তখনি ডাক্তারি

নিকটের এক ডাক্তার বাড়ী নিয়ে যাওয়া হল। যতক্ষণ না তারা সুস্থ হয় ততক্ষণ তাদের দাদুটিকে ডাক্তারবাবুর বাড়ীর বারান্দায় অপেক্ষা করতে থাকল।

ভোরের দিকে মধু একখানা ভাড়া গাড়ীতে বৌ আর খোকাটিকে নিয়ে পৌঁছল তার শ্বশুরবাড়ীতে। সে চন্দ্রবাবুর সঙ্গে যায় নি, বা তাঁকে তাঁর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে নি। দরকার হয় নি, খেয়ালও হয় নি। তাই এখন সমস্যা হল, ছেলেটিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া যায়। কেউ পরামর্শ দিল—পুলিশের কাছে নিয়ে এস, তারা ঠিক পৌঁছে দেবে।

পুলিশের নাম শুনেই, মধুর বৌ খোকাকে টপ্ করে তুলে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অনেক খোঁজ-খবর করেও চন্দ্রবাবুর সন্ধান জানতে পারল না মধু। বেশীদিন তাদের কলকাতায় থাকবার উপায় নেই, ব্যবসায়ের ক্ষতি হবে। অগত্যা, মাসখানেক পরে যখন তারা ওড়িশায় ফিরল, খোকাকেও সঙ্গে নিল। বাড়ীর মানুষদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ ক'রে গেল তারা যেন চন্দ্রবাবুর খোঁজ করে। খবর পেলেই যেন নিয়ে আসবে খোকাকে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ী থেকে কোনও চিঠি মধু পেল না। সামনের বছরে ফের তাকে কলকাতায় আসতে হবে কাজে। বাধ্য হয়ে তারই অপেক্ষায় সে রইল।

বছর ঘুরে গেছে। মধুরা আবার এসেছে কলকাতায়। যে গলিতে শ্বশুরবাড়ী, সেই গলিতে এক অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের বাস। গলির মুখেই তাঁর দোতলা বাড়ী। বাড়ীখানাকে খুব সাজানো হয়েছে আলোর মালা দিয়ে, ফুল পাতা দিয়ে। ভোরবেলা থেকেই দরজার

গোড়ায় সানাই বেজেছে; বিয়েবাড়ী—ভদ্রলোকের মেয়ে অমলার বিয়ে। সন্ধ্যার পর দূরে গোরার বাজনা শোনা গেছেই, পাড়া-পড়শীরা সবাই যে যার ঘরের দাওয়ায় বারান্দায় এসে হাজির। যদুও দাঁড়িয়েছে দাওয়ায়। তার বৌ ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মারছে।

বাতি জ্বালিয়ে বাজনা বাজিয়ে বর এল। বরের চতুর্দোলা ঘিরে বেলফুলের গেঁদাফুলের মালার ঝালর ঝুলছে। তারই মাঝখানে ব'সে আছে বর ঝলমলে টোপর মাথায় দিয়ে। যদু ভাবছে,—'খাসা চেহারা'। হঠাৎ সে চমকে উঠল—মুখ যে চেনা চেনা লাগছে! তাই তো—এ যে চন্দরবাবু! একদিন একটু ক্ষণের জন্য দেখা। কিন্তু সেই ক্ষণ কি ভোলবার? না, সেই মুখ ভোলবার?

একদৃষ্টে চেয়ে রইল যদু। বর বাড়ীর ভিতরে চলে গেলে, সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে ঘরে এসেই, খোকাকে তুলে নিয়ে নাচতে লাগল আর বলতে লাগল, "বাড়ী যাবে খোকাবাবু, বাড়ী যাবে খোকাবাবু।"

বৌ তো অবাক, জিজ্ঞাসা করল, "খবর পেয়েছ?"

যদু—আরে ওই তো, চন্দরবাবুই তো বর।

বৌ—তাই নাকি? ওমা, কোথা যাব!

যদু—কেন? মন্দ কথাটা কি হল? তাঁর বয়েস আছে, পালবার ক্ষেমতা আছে, আর একটা বিয়ে করবেনই না?

বৌ—না, তাই বলছি। শ্যামবর্ণ যদিও, চেহারাটা সুন্দর। কিন্তু আগে থেকে অত নাচানাচি ক'রো না। নতুন বিয়ে করছেন। বৌ কি বলবে কে জানে?

যদু—হাঁ, সেইখানে একটা খটকা আছে বটে! যাই হোক, তাঁরা একটু থিতিয়ে বসলেই আমি গিয়ে খোকাকে নিয়ে আসছি।

যাঁদের জিনিস, তাঁদের জিম্মেয় দিয়ে দিতে পারলে বাঁচি !

সেদিন রবিবার। হরিধন দত্তর দোতলার বারান্দায় চন্দ্রনাথ একটা আরাম চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। নতুন বৌ অমলা শোবার ঘরে কি কাজ করছে। অপরিচিত পায়ের শব্দ শুনে চন্দ্রনাথ তাকালেন, দেখলেন বারান্দা দিয়ে যত্ন আসছে, তার কোলে একটি ছোট ছেলে। তিনি খবরের কাগজ রেখে উঠতে যাবার আগেই, সে এসে ছেলেটিকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। চন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না, হতবুদ্ধির মত চেয়ে আছেন। প্রণাম সেরে মাথা তুলেই যত্ন ছলছল চোখে—তার চোখে সহজে জল আসে—ভাঙা গলায় বলল, "ঠাকুর মা-ঠাকরুণকে আর ফিরিয়ে দিলেন না। এইটিকে দিয়েছেন,—আমার বৌকেও নিয়েছেন," বলে ছেলেটিকে এগিয়ে দিল। চন্দ্রনাথ আকুল আগ্রহে দুই হাত বাড়িয়ে খোকাকে কোলে টেনে নিলেন। যত্ন তাঁর পায়ের কাছে বসে আছে। তিনি কেবল ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরে চুপ করে আছেন দেখে, সে নিজেই আরম্ভ করল, "সেই জাহাজ ঘাটে আপনার সঙ্গে দেখা। আপনি চলে এলেন। আমি বসে রইলুম। কেন জানি আমার মনে বিশ্বাস হয়েছিল, আরও নৌকো আসবে। এলও তাই,—সন্ধ্যা বেলা নাগাদ। এই খোকাকে আর আমার বৌকে মাঝিরা জল থেকে তুলে এনেছিল। আপনার ঠিকানা জানিনে, কত খোঁজ করে কিছু হল না। শেষকালে ওকে নিয়ে গেলুম আমাদের দেশে। কেষ্টপাড়ায় আমার বাড়ীতে এত দিন ছিল এ।

"ভগবানের দয়ায় এমন যোগাযোগ হল। আপনার শ্বশুরবাড়ী থেকে এই বাড়ীর ঠিকানা জেনে নিয়ে তবে আসছি। আপনার ধন

আপনার হাতে দিলুম, এখন আমার ছুটি।" ব'লে সে উঠল।

চন্দ্রনাথ তার হাত চেপে ধরলেন, বললেন, "তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না। আবার এসো। তোমার বৌকে পেয়েছ জেনে কী যে আনন্দ হল।"

অমলা এতক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনেছে। এখন সে বেরিয়ে এল বারান্দায়। সে আসতে মণ্টু চলে গেল।

চন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, "ওগো দ্যাখ দ্যাখ, বিধাতার লীলা দেখ।"

অমলা—কার ছেলে না কার ছেলে, কে-না-কে দিয়ে গেল, অমনি তুমি বিশ্বাস করলে?

চন্দ্র—মণ্টুকে আমি চিনি। সেই সুশীলকে এনে দিয়েছিল। সে আমাকে ঠকাবে না। ওড়িশার লোক ও।

অমলা—উড়েদের গুণপনা জানা আছে। আমাদের একটা উড়ে বামুন ছিল, হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছে।

ব'লে সে গজগজ ক'রে ঘরে ঢুকে গেল। তার অপ্রসন্ন মুখ দেখে চন্দ্র আর কিছু বললেন না। তিনি খোকাকে কোলে নিয়ে ব'সে গভীর স্নেহে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন, আর আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, "আমার বাবা, আমার গোপাল, আমার সুশীল—"। আর কারও স্মৃতি মনে জাগাতে, তাঁর দুই চোখ থেকে দুটি জলধারা নেমে এল।

নতুন সুশীল নতুন জীবনে পা দিল।

সাত

বিয়ের আগে অমলা শুনেছিল, চন্দ্রনাথ বিপত্নীক বটে কিন্তু তাঁর ছেলেমেয়ে নেই। এখন এই একটি উপসর্গ জোটাতে সে মোটেই প্রসন্ন হল না। সুশীলের জন্য অমলাকে কিছু করতে হয় না। সরমী এবং অন্য চাকর-বাকরেরা সব করে। তবু সুশীলকে নিয়ে খেলা দিতে, তার খাওয়ার কাছে বসতে, তাকে নিয়ে ঘুম পাড়াতে অমলার ভাল লাগে; অবসরও কাটে ভাল। তার দিদির একটি খোকা আছে, সুশীলকে দেখে বোধ হয় সেই খোকার কথা মনে পড়ে যায়। সুশীল যখন টলতে টলতে এসে, কচি কচি হাত দিয়ে তার মুখে থাবড়ায় আর হাসে, তখন অমলা তাকে আদর না ক'রে পারে না। অমলার স্বভাব মন্দ নয়। তবে সুনীলের কথা আলাদা। সুনীলের স্নান খাওয়া দেখা যে তার কর্তব্য সেটা অমলা বোঝে, এবং সেইজন্যই বেশী বিমুখ হয় তার প্রতি। ভাবে আপদ বালাই জুটেছে।

সুনীল সুশীল দুই ভাইয়ে আবার দেখা হল। দুজনে দুজনকে চিনতে পারল কি না কে জানে। সুনীলকে দেখেই সুশীল খল্ খল্ ক'রে হাসতে হাসতে এসে এমন উৎসাহে জড়িয়ে ধরল যে, দুজনের টাল সামলানো দায়। সুনীল এই অপ্রত্যাশিত আদরে একটু অবাক হলেও তার মুখ চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

প্রকাণ্ড বড় বাড়ী, কত ঘর বারান্দা। দুই ভাইয়ে আনন্দে এঘর ওঘর বেড়ায়, বারান্দায় ছুটোছুটি করে। ঘরে রঙীন কাচের শার্সির ভিতর দিয়ে রঙীন আলো মেঝের উপর পড়তে দেখে দুজনে ধরতে যায় সে আলো। জানালায় চেয়ে দ্যাখে, তাও কেমন লাল নীল সবুজ

হয়ে যাচ্ছে। যে রঙে সুনীল হাত দেবে, সুশীল গুড়্‌গুড়িয়ে এসে তাকে ঠেলেঠুলে সেই রঙে হাত দেবে। এক সঙ্গে তাদের ওঠা-বসা খাওয়া-দাওয়া। একই সঙ্গে বাড়ছে দুটি ভাই।

কিন্তু এমনি বেশী দিন চলল না। যখন চন্দ্রনাথ একলা সুনীলকে নিয়ে বাস করছিলেন, দুটি মাত্র প্রাণী তখন বাড়ীতে। দুজনের খাই-খরচা চন্দ্রনাথই দিতেন। সুশীলের খাওয়ার জন্য হিসাব ক'রে তার টাকা খরচ করতে মোটেই তাঁর মন চায় নি। কিন্তু এখন তো তিনি বিয়ে করেছেন, আবার সুশীলও এসেছে। চন্দ্রনাথ দেখলেন, সুশীলকে যেমন ভাবে রাখা হয়েছে, যত উত্তম খাওয়া পরার ব্যবস্থা হয়েছে, সুনীলের জন্য সে রকম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুশীলের অনেক টাকা, তাকে যত দূর পারা যায় সুখে সোয়াস্তিতে মানুষ ক'রে তোলা উচিত। কিন্তু তিনি নিজে তো বড় লোক নন। সুনীলকে তাঁর অবস্থা-মতই মানুষ করা দরকার, এবং সে ব্যবস্থা শীঘ্রই হওয়া দরকার।

দুদিন পরেই সব বন্দোবস্ত আলাদা হল। বাড়ীর ঠাকুর সুশীলের জন্য এবং চাকর-বাকরদের জন্য রান্না করে। সুশীলের খাওয়া কেমন হবে তা সরলাই বলে দেয়, যেমন বলবার কিছু। কেবল খরচটা যায় সুশীলের তহবিল থেকে। চন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারের রান্না হিন্দুস্থানী ঝিই করে। অমলা তদারক করে।

তাই দুপুরের খাওয়া দাওয়ার সময়ে এক রবিবারে সুনীল দেখল, সুশীলের ঘরে তাকে ফুলকাটা আসন পেতে, রুপোর থালাবাটি সাজিয়ে কত কী খেতে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু সুনীলকে ডাকা হয় নি। সে ঘরে অমলাও আছে। অমলাকে সুনীল কেন জানি ভয় করে,

পারতপক্ষে কাছে যায় না। কি কাজে চন্দ্রনাথ সেই দিক দিয়ে আসছিলেন। তিনি দেখলেন, সুনীল অত্যন্ত করুণ বিষণ্ণ মুখে সুশীলের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ভিতর থেকে সরসীর গলা পেলেন, "এখানে কেন দাঁড়িয়েছ? ওদিকে যাও।" তিনি তাড়াতাড়ি সুনীলের হাত ধরে সরিয়ে এনে বললেন, "সুনীল, চল, আমার সঙ্গে খাবে চল।"

কথাটা অমলা শুনতে পেয়ে উঠে এল। চন্দ্রনাথ তাকে বললেন, "সুনীলের খিদে পেয়েছে। আমাদের দুজনের খাবার এক সঙ্গে দিতে বল।"

আফিসের দিন তিনি আগে খেয়ে বেরিয়ে যান, পরে ছেলেরা খায়।

খেতে ব'সে তিনি অমলাকে বললেন, "সুশীল আর সুনীলকে একই সময়ে খেতে দেওয়া ভাল। সুনীলও ছেলেমানুষ, দেরীতে খেলে অসুখ করতে পারে।" অমলা তাতে উত্তর করল, "তবে ঝিই না-হয় বসবে সুনীলের খাওয়ার কাছে। সুশীলের খাওয়া আগে দেখতে হবে আমাকে। ওর দেখাশোনা করবার জন্য আমাদের টাকা দেওয়া হয়।"

চন্দ্র—সরসী তো আছে?

অমলা—সরসী ঠিক ঠিক দেয় কি না বুঝতে হবে না?

চন্দ্রনাথ আর কি বলবেন? এও মনে ভাবলেন, 'অমলা যা বলেছে, মিথ্যা নয়। সুনীলের যখন মা নেই, তখন ওকে ঝি-চাকরের হাতে মানুষ হতে হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? সুনীলের তবু আমি আছি। সুশীল বেচারার মা নেই, বাবাও নেই। অমলা যদি ওকে একটু স্নেহ যত্ন করে, সে তো সুখেরই কথা।'

এমনি ভাবে দুটি ছেলে বড় হয়। দুই ভাই এখনও এক সঙ্গে খেলে বই কি। ঝগড়াও হয় তাদের মধ্যে। বিশেষতঃ সুশীল সুনীলের উপর সর্দারি করতে চায়; সুনীল তার কথামত না চললে, চেঁচিয়ে মেচিয়ে, কাপড় টেনে অস্থির করে তোলে তাকে। সরমা সব ঝগড়ায় সুশীলের পক্ষ নিয়ে সুনীলকে দোষ দেয়। তাই সুনীল একটু দূরে দূরেই থাকে। তার আর সুশীলের মধ্যে হঠাৎ কেন এত পার্থক্য এসে গেল, সে কিছু বুঝে উঠতে পারে না। ভাইয়ের সঙ্গে সমান সমান ভাবে খেলতে পারে না আর।

সে বাড়ীর বাইরের উঠোন মস্ত বড়। উঠোনের সামনে রাস্তার উপরে প্রকাণ্ড লোহার ফটক। উঠোনের এক ধারে দরোয়ানের ঘর। দরোয়ানের একটি ছেলে আছে, নাম দুলাল, প্রায় সুনীলের বয়সী বা কিছু বড় হবে। সুনীল উপরের বারান্দা ছেড়ে, এই বাইরের উঠোনে খেলতে সুরু করল। তার খেলার সঙ্গী জুটে গেল দুলাল। সরমা বলল, "বাইরে খেলুক, ভালই। ঘরের ভেতরে গোলমাল হবে না।"

চন্দ্রনাথ ভাবলেন, 'সব দিক থেকে সুশীলের সঙ্গে এত তফাৎ থেকে একসঙ্গে খেলবেই বা কি করে? খেলনাপত্র, খেলবার জায়গা, খেলবার সঙ্গী পেয়েছে, এই ঢের। গলির ভিতরে যে ছোট বাড়ীতে ছিলাম তার তুলনায় এ বাড়ী তো স্বর্গ।'

নিশ্চিন্ত মনে সুনীল আর দুলালের খেলা চলে। ঘাস-ভরা মস্ত উঠোন, গাড়ী-বারান্দায় কাঁকর পাতা। উঠোনে রোদ পড়ে, হাওয়া বয়। ফটকের দু পাশে, রেলিং-এর ধারে ধারে বকুল ফুল আর কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ। যখন কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটে, গাছে যেন আগুন লেগে যায়। বকুল ফুলের সুগন্ধ সারা উঠোন ছেয়ে ফেলে। সুনীল আর

দুলাল গাছতলা থেকে ফুল কুড়িয়ে এনে মালা গেঁথে বেড়ালের গলায় পরায়, পাখীর খাঁচা সাজায়। বৃষ্টির মতন ক'রে নিজেদের মাথায় ফুল ঢালে। দুলালের একটা ময়না পাখী আছে, সেটাকে রোজ সকালে সে কথা বলতে শেখায়। পাখী ডাকে 'দুলাল, দুলাল'। সুনীলের নাম বলতে এখনও শেখে নি। পাখীর জন্য পোকা ধরে তারা, ঘাসে ঘাসে খুঁজে। বেশ আনন্দেই দিন কাটে।

মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যায় সুনীলের। দুলালের একটা পোষা বেড়ালও আছে। বেড়ালের যখন তিনটা বাচ্চা হল, তখন দুই বন্ধুর আহ্লাদ ছাখে কে। ছানাদের চোখ ফোটে, তারা মায়ের দুধ খায়, মা তাদের গা চেটে চেটে আদর করে। বেড়াল মায়ের ভালবাসা দেখে সুনীল মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে।

তারপর একদিন একটা ছানা সুনীলের কোলে ফেলে দিয়ে দুলাল বলল, "যাও"। ছানাটা সুনীলের জামা আঁকড়ে ঝুলছে। সুনীল তাকে কোলে চেপে ধ'রে দৌড়ে চলে গেল ভিতরে, ইচ্ছাটা সুশীলকে দেখায়। কিন্তু অমলা তখন ছিল সুশীলের কাছে। অমলা মোটে বেড়াল পছন্দ করে না। সুনীলকে বেড়ালছানা আনতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, "আনিস্ না, আনিস্ না। ফেলে দে ওটাকে। ঘর-দোর নোংরা করবে।" সুনীলের চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। সে ফিরে গিয়ে দুলালকে ছানাটা দিয়ে বলল, "তোমার কাছে থাক। আমি যখন আসব, ওকে নিয়ে খেলব। আমার ভাত থেকে ওর ভাত এনে দেব।"

রোজ বিকালে ভাল কাপড় জামা প'রে সুশীল যায় চাকরের সঙ্গে পার্কে বেড়াতে। ছুটির দিনে কখন-সখন চন্দ্রনাথ হাওয়া খেতে

বেরোন ; সুনীলকে সঙ্গে নেন। খোলা মাঠে গাছের ছায়ায় বেড়াতে কি ভালই না লাগে। ছাগল গরু চ'রে বেড়ায় ; পাখীরা শিস্ দিয়ে দিয়ে গাছের ডালে নাচে। কত অজানা পাখী। চন্দ্রনাথ তাদের নাম ব'লে চিনিয়ে দেন সুনীলকে।

আট

সুনীলের বাড়ীর বাইরের উঠোনে একদিন একটি বুড়ো মানুষ ঢুকে এসে চারিদিকে চাইছে। তখন দরোয়ান কি কাজে ভিতরে গিয়েছে। দুলাল বসে আছে ফটকের কাছের টুলটাতে।

বুড়ো লোকটি জিজ্ঞাসা করল, "এ বাড়ীতে কে থাকেন ?" সুনীল দোতলার বারান্দায় রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়েছিল, দুলাল আঙুল তুলে তাকে দেখিয়ে বলল, "ও"। ইতিমধ্যে দরোয়ান এসে জিজ্ঞাসা করল, "কাকে চাও ?"

বুড়ো মানুষ—এ বাড়ীতে এখন কে থাকেন জিজ্ঞাসা করছিলাম।

দরোয়ান—যাঁর বাড়ী তিনি থাকেন।

বুড়ো—যাঁর বাড়ী তিনি তো অনেকদিন গত হয়েছেন। বাড়ীখানা কি বিক্রী হল ? না কি— বলতে গিয়ে থেমে গেল। বাড়ীর দরজা জানালা খোলা দেখে, ভজু ভারি আশা করে ঢুকেছিল, বুঝি ছোটবাবু ফিরে এসেছেন। অথচ বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছিল না। গয়া থেকে ফিরে কাশী গিয়েছিল ভজু, কাশীতে অসুখ হয়ে আটকে পড়ে। পুরনো মনিবের স্মৃতি তাকে টানছিল। যে বাড়ীতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ

করেছেন, যে বাড়ীতে তাঁর সেবায় ভজহরির জীবনের এক বছর কেটেছে, সেই বাড়ীখানা দেখবার জন্য তার মন আনচান করছিল। তাই সে আবার ছুটে এসেছে কলকাতায়। তা ছাড়া, মুঙ্গের থেকে সত্যবাবু কি খবর আনলেন, তা'ও জানা হয় নি।

দারোয়ান একটু বিরক্ত হয়েই জবাব দিল, "বিক্রী হতে যাবে কেন? তিনি এ বাড়ীর মালিক, ঐ হরিমোহন বসুর নাতি, তিনিই এ বাড়ীতে থাকেন।"

নাতি? ছোটবাবুর ছেলে? তা হলে ছোটবাবু কোথায় গেলেন? এই রকম নানা প্রশ্ন জাগছে ভজুর মনে।

সুনীল বাড়ীর ভেতর থেকে উঠোনে এল এ সময়ে। সুনীলকে দেখেই সে দু পা এগিয়ে গেল। এই কি সেই নাতি? কিন্তু—এমন সামান্য বেশ, এ রকম বিশ্রী রূপ কেন? শুধু জিজ্ঞাসা করেই ফেলল, "এঁরই বাড়ী?"

দারোয়ান খেঁকিয়ে উঠে বলল, "এর কেন হবে? তোমার বাপু অত খবরে দরকার কি? তুমি যাও।" বলে সে ফটকের সামনে দাঁড়াল। সুনীল এর মধ্যে অনেক কাছে এসেছে। ভজু যাবে, কি যাবে না—ইতস্ততঃ করছিল। কিন্তু সুনীলের মুখের দিকে তাকিয়ে, তার পা আর চলতে চাইল না, সে মাটিতে বসে পড়ল—এ যে ঠিক ছোটবাবুর চোখ দুটি! চুলও তাঁর মত ঘন কালো, কোঁকড়া কোঁকড়া!

বুড়ো মানুষকে অমনভাবে বসে পড়তে দেখে, সুনীল কেমন ঘাবড়ে গিয়ে বাড়ীর ভিতরে চলে গেল। ভজহরিও আস্তে আস্তে উঠে রওনা হল, সত্যবাবুর খোঁজে।

সত্যবাবুকে পেতে বিশেষ অসুবিধা হল না। তিনি তাঁর পুরনো

বাসাতেই ছিলেন। ভজুকে দেখে ভারি খুশি হলেন।

তাঁর কাছ থেকে ভজহরি শুনল, কেমন ক'রে জেঠাবাবুর সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু জেঠাবাবু তখন বেঁচে নেই। কৃষ্ণধনের ছেলের কি হল, কার কাছে গেল, কেমন ক'রে ঝড়ের রাতে তারা জাহাজ থেকে নৌকোয় উঠে বাঁচল, সব শুনল ভজু।

সত্যবাবু বললেন, "তার ছেলেকে যে আমরা পেয়েছি, সে যে হরিধনের এবং কৃষ্ণধনের সম্পত্তি ভোগ করতে পারছে, সেটা আমাদের খুবই সৌভাগ্য বলতে হবে।"

ভজহরির মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, "আপনি কিছু ভুল করেন নি তো?"

"কিসের ভুল?" জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

ভজু—যাকে জেঠাবাবুর ছেলে ব'লে বাড়ীঘর দিয়েছেন সে সত্যিই তাঁর ছেলে তো?

সত্যবাবু—কেন তুমি এ রকম সন্দেহ করছ ভজু? আমি খবরাখবর না নিয়েই কি দিয়েছি?

ভজু—ঠিক খবর পেয়েছিলেন তো?

সত্যবাবু—কি আশ্চর্য! ওর আপন জেঠামশাই, যাঁর বাড়ীতে ও মানুষ হয়েছে, তিনি নিজেই এনে দিয়েছেন, কৃষ্ণধনের ছেলে বলে। এতে সন্দেহ করবার কি আছে? চন্দ্রবাবু ভদ্রলোক, মিছে কথা বলবেন না।

ভজু—না, সন্দেহ আর কি। তবে আমার কেন জানি মন মানছে না। আচ্ছা, ওখানে আর একটি ছোট ছেলে আছে, আপনি দেখেছেন কি? বোধ হয় দেখেন নি। দেখলে আপনি ঠিক বুঝতে

পারতেন, সে ছেলেটির চাউনি অবিকল ছোটবাবুর চাউনির মত। তেমনি মাথাভরা কোঁকড়া চুল।

সত্যবাবু—তাকে আমি দেখেছি। সে হ'ল চন্দ্রবাবুর ছেলে। তার চোখ দুটি বড় বড় বটে, তাই বোধ হয় তোমার ওরকম মনে হয়েছে। কৃষ্ণধনেরও চোখ বড়ই ছিল। চন্দ্রবাবুরও চোখ বড়, মাথাভরা চুল।

ভজু আর কিছু বলল না ; কেবল নিঃশব্দে ব'সে দু-একবার মাথা নাড়ল, তার অন্তর যেন বলছে,—'না না'। এর পর তার আর কলকাতায় থাকতে ইচ্ছা হল না। সে সত্যবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল। সেই যে গেল, আর তাকে তিনি দেখেন নি।

সপ্ত

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। সুনীল ও সুশীল দুজনেই বড় হয়ে উঠেছে। চন্দ্রনাথ সুনীলকে শিখিয়েছেন অমলাকে 'মা' আর তাঁকে 'বাবা' বলে ডাকতে। অমলা প্রথমে আপত্তি করেছিল। কিন্তু তিনি বললেন, "আমি ওর বাবা। তোমাকে ছাড়া আর কাকে মা বলবে ?"

সুনীলের দেখাদেখি সুশীলও চন্দ্রনাথকে বাবা আর অমলাকে মা ডাকে।

এখন আর সরমী নেই। সুশীলের জন্য একটি গৃহশিক্ষক রাখা হয়েছে ; সুশীলের বাড়ীতেই থাকেন। অবশ্য চন্দ্রনাথ সব ব্যবস্থার

তত্ত্বাবধান করেন। ক্রমে স্কুলে যাবার বয়স হলে, দুই ভাই দুই স্কুলে ভর্তি হল।

সুনীল কাছাকাছির এক প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি হয়েছে। তার পরনে সাধারণ কাপড় জামা, পায়ে চটি জুতা; এই বেশেই সে যায় স্কুলে। কিন্তু পড়াশোনায় তার খুব মনোযোগ। ক্লাসে সকলের উপরে থাকে। তার প্রকৃতি কিছু গম্ভীর বলে সমপাঠীদের সঙ্গে বড় বেশী ভাব হয় না।

সুশীল ভর্তি হয়েছে মস্ত বড় স্কুলে। সেখানে বড় লোকের ছেলেরাই সাধারণতঃ যায়। সুশীল স্কুলে যাবে ব'লে নতুন গাড়ী ঘোড়া কেনা হয়েছে। মাষ্টার মশাই তাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসেন, ছুটির পর নিয়ে আসেন। তার হাসিখুশি মেজাজ, স্ফূর্তিবাজ স্বভাব। অনেক বন্ধু জুটে গেছে তার। এদের ভিতর কাউকে কাউকে স্কুলের শিক্ষকরা দুষ্টু ছেলে ব'লে জানেন।

এই বন্ধুরা সুশীলের বাড়ীতেও আসা-যাওয়া করে। ঝি-চাকরদের কাছ থেকে তারা অনেক কথা শোনে। সুশীলের কেন এত ভাল জামা কাপড়, তার জন্য কেন গাড়ী ঘোড়া আছে, কেন মাষ্টার রাখা হয়েছে, সব তারা শুনেছে। একটু একটু ক'রে ওরা জেনেছে যে, ওই প্রকাণ্ড বাড়ী একা সুশীলের। চন্দ্রবাবু সুশীলের মেসোমশাই, দেখা-শোনা করেন ব'লে তিনি অমলা আর সুনীলকে নিয়ে ও-বাড়ীতে থাকতে পেয়েছেন। সেইজন্য সুনীল থাকে ছোট একটা ঘরে, তার জামা কাপড় সেইজন্য গরীবদের মত।

বন্ধুদের মধ্যে 'নরেন' যার নাম, সে মফঃস্বল থেকে এসেছে, বয়সে কিছু বড়। গুণপনাও তার বেশী। তার পকেটে সর্বদাই

গুল্‌তি থাকে। স্কুলের লাগা ছোট একটা মাঠ আর দু'চারটা বড় গাছ আছে। ক্লাসের ছুটির সময়ে সেখানে ছেলেরা খেলা করে। গাছের ডালে পাখী কি কাঠবিড়ালী ব'সে থাকলে নারেন গুল্‌তি মেরে তাকে নির্ঘাত নামিয়ে ফেলে। তরতর্ করে গাছে চ'ড়ে গিয়ে কাঁচা পেয়ারা কাঁচা আম পেড়ে আনা তার কাছে কিছুই শক্ত কাজ নয়। এই সব ফল যোগাড় ক'রে সে নিজে খায়, বন্ধুদেরও দান করে। খেলার মাঠে তার প্রতিপত্তি খুব। ঘুড়ির পাঁচ লাগিয়ে অন্যের ঘুড়ি কাটাতে সে ওস্তাদ। কাজেই সে যে বন্ধুদলের সর্দার হবে, তা আর বিচিত্র কি?

স্কুলে টিফিনের ছুটির সময়ে বাড়ী থেকে চাকরে সুশীলের টিফিন নিয়ে যায়। অনেক ছেলেই দোকানের খাবার কিনে এনে খায়। সুশীলের সঙ্গীদের কয়েকজন এই রকম খাবার এনে খেত। একদিন বিলাস নামে একটি ছেলে এসে সুশীলকে বলল, "ভাই, তোর কাছে পয়সা আছে? আমি খাবারের পয়সা আনতে ভুলে গেছি।" সুশীল হাত-খরচের জন্য প্রতি মাসে কিছু টাকা পেত। সে টাকা ওর নিজস্ব, কেউ হিসাব চাইত না। সে পকেট হাতড়িয়ে আট আনা পয়সা বের করে বন্ধুর হাতে দিল। বিলাস বলল, "বাঁচালি ভাই, কাল পয়সা শোধ দেব।" কিন্তু সে 'কাল' আর এল না। দুদিন বাদে আরেক বন্ধুও পয়সা আনতে ভুলে গেছে ব'লে সুশীলের কাছে খাবারের পয়সা চাইল। ক্রমে এমন হল যে রোজই সুশীল কাউকে না কাউকে পয়সা দেয়। কিন্তু সে পয়সা যে ফেরৎ আসে না, বলাই বাহুল্য। মাসের পনের কুড়ি দিন যেতে না যেতে সুশীল বেচারার পকেট খালি। একটা ঘুড়ি কি লাট্টু কেনবার দামও থাকে না। এ

নিজে মুখে কিছু প্রকাশ করতে বা পয়সা ফেরৎ চাইতে তার লজ্জা করে।

এই রকম একদিন সুশীলের পকেট খালি, বিলাস খাবার কিনতে পয়সা চাইল। সুশীল বলল, "ভাই আজ পয়সা নেই।"

বিলাস—ধার করে দে না।

সুশীল—ধার কার কাছে করব?

বিলাস—ঐ দোকানীর কাছে। তোর নাম করলে সে ধারে খাবার দেবে। পরের মাসে শোধ করলেই চলবে।

সুশীল জবাব দেবার আগেই সে ছুটে গেল দোকানে খাবার আনতে।

এর পর, দোকানীর কাছ থেকে সুশীলের নামে প্রায়ই ধারে খাবার আসে। সুশীলের মন দুর্বল, প্রতিবাদ করতে পারে না। মাসের প্রথমে হাতখরচা পেয়ে, দোকানীর ধার শোধ করতে অনেক পয়সা বেরিয়ে যায়। সে মাসের শেষে আরও বেশী ধার হয়ে পড়ে। ক্রমে দোকানীর সন্দেহ হল। সে বলল, "আসছে মাসের প্রথমেই সব টাকা শোধ না দিলে, আর ধারে খাবার দেব না।" মাসের প্রথমে খরচার টাকা সমস্ত দিয়েও অর্ধেক ধার শোধ হল না।

তখন দোকানী মাষ্টার মশাইয়ের কাছে নালিশ করল। মাষ্টার জানালেন চন্দ্রবাবুকে। সুশীল স্কুল থেকে ফিরলে পর, চন্দ্রনাথ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপার কি? সে মাথা নীচু করে রইল, উত্তর দিতে পারল না। চন্দ্রনাথ বুঝলেন এতে বন্ধুদের কারসাজি আছে। তিনি বললেন, "এবার আমি ধার শোধ করে দিচ্ছি। কিন্তু আর ধারে খাবার আনতে দিও না। মহাবাবু পছন্দ করবেন না। ছোটবেলা থেকে ধার অভ্যাস করা বড় খারাপ।"

সুশীল জানত মেসোবাবু তাদের কর্তাকর্তা-বিধাতা। সুতরাং খাবে খাবার কেনা বন্ধ হল। সুশীলের সঙ্গীরা ভীষণ চটে গেল চন্দ্রনাথের উপর। নরেন বলল সুশীলকে, "তোর মেসো দেখছি বাপেরও বাড়া হয়ে উঠেছে। তবু যদি নিজের মেসো হত।"

সুশীল অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কার কথা বলছ?"

নরেন—তোর মেসোর কথা।

সুশীল—মেসো কে?

হেসে উঠে চীৎকার সুরে নরেন বলল, "চন্দর বাবু—আবার কে? ও বুঝি তোর বাবা? বাবা হলে কি আলাদা থাকত? ও তোর মেসো। তোর বাড়ীঘর তোর মা তোকে দিয়েছে। তাই চন্দরবাবু থাকে ছোট ঘরটাতে গরীবের মত।"

বন্ধুরা যাই বলুক, ছেলেমানুষ সুশীল, যাঁদের এত দিন ধরে মা বাবা বলে এসেছে, যাঁদের বাস্তবিক ভাল বেসেছে, তাঁদের পর মনে করতে একেবারেই পারে না। বাবা-মার সঙ্গে সন্তানের কেমন সম্বন্ধ থাকে, তা সে ঠিক জানে না। সুশীলও তো শোয় আলাদা, ছোট একটা ঘরে। অত রকম কথা তার মাথায় ঢোকে নি।

সুশীলের বন্ধুরা তার বাড়ীতে খেলতে আসে। তখন কেউ হয়ত বলে, "এরে ভয়ানক জলতেষ্টা পেয়েছে।" কেউ বলে, "ওরে, আজ বাড়ীতে খেয়ে আসি নি, সোজা ইস্কুল থেকে চলে এসেছি।" কাজেই সরবত আসে, কচুরি সন্দেশ কেনা হয়। এইসব ছোটখাট খরচ বিশেষ ধরা পড়ে না। সুশীল বন্ধুদের মন যোগায় বটে, কিন্তু স্কুলে তাদের দুষ্টুমিতে যোগ দেয় না। সে বুঝতে পারে, এসব দুষ্টুমি ভারি খারাপ।

দুষ্টুমির সর্দারও সেই নরেন। পণ্ডিত মশাই ক্লাসে একটু ঘুমোন। তিনি ছেলেদের ব্যাকরণ মুখস্থ করতে দিয়ে যেমনি ঢুলতে থাকেন, অমনি নরেনের পকেট থেকে বেরোয় ঠোঙা। ঠোঙার ভিতরে গোলাপি রেউড়ি, বাতাসা, গুজিয়া ধরণের শুকনো মিষ্টি। ঠোঙাটা চালান হতে থাকে এর হাত থেকে ওর হাতে। সুশীলের হাতে এলে সে পাশের জনকে দিয়ে দেয়, নিজে নেয় না। তারপর খানিক চলে গুনগুনিয়ে ব্যাকরণ মুখস্থ, খানিক চলে মুখের আরেক কাজ। ধড়মড় করে পণ্ডিত যেই জেগে যান, ঠোঙা লুকিয়ে যায় যার যার পকেটে।

অঙ্কের মাস্টার বোর্ডে অঙ্ক বোঝাচ্ছেন, 'ম্যাও' শব্দ হয় ক্লাসের ভিতর। মাস্টার ফিরে চাইতেই নরেন বলে, "বাইরে বেড়াল ডাকছে।" সাঙ্গোপাঙ্গরা নরেনের দিকে চেয়ে চোখে চোখে হাসতে থাকে। ভাগ্যে সুশীলের উপর অভিভাবকদের প্রভাব ছিল, তাই সে এসবে যোগ দিতে পারত না। বন্ধুরা বাড়ীতে এলে মাস্টার মশাই বিশেষ নজর রাখতেন তাদের চালচলন ব্যবহারের উপর। দুষ্টুমি আরম্ভ হলেই দমন করতেন। তাই বন্ধুরা মনে মনে মাস্টারের উপর চটা।

মাস্টার মশাইয়ের যত্নে সুশীল পরীক্ষা পাশ করে উপরের ক্লাসে উঠল। নরেন কিন্তু উঠতে পারল না। পারবেই বা কি করে? সমস্তক্ষণ যার কুকাজের দিকে মন, সে কি স্থির হয়ে পড়াশোনা করতে পারে? কিন্তু তবু নরেন সুশীলকে ছাড়ল না। স্কুলের টিফিনের সময় এবং স্কুলের পর সুশীলের বাড়ীতে এসে তার সঙ্গে মিশত। তার টাকার গন্ধ পাওয়া অবধি নরেন জোঁকের মত লেগে রইল সুশীলের গায়ে।

সঙ্গ দোষ ভয়ানক দোষ। সঙ্গীদের মন্দ প্রভাবে ছোট সুশীলের মনে যে ন্যায়-অন্যায় বোধ ছিল সে বোধ ক্রমে নিস্তেজ হয়ে এল। যত বড় হতে লাগল সে, বন্ধুদের কাজগুলো আর তত খারাপ বলে মনে হত না তার। বিশেষতঃ নরেনের মধ্যে এমন একটা প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা ছিল যে তার কথা সুশীল ঠেলতে পারত না।

একদিন নরেন তাকে বলল, "মাষ্টারকে অত ভয় করিস্ কেন? ও তোর মাইনে করা লোক। ওর কথা মানবার দরকার কি?" সে বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তি না করতে চায় মাষ্টার মশাই তাতে বাধা দেন ব'লে সুশীল মনে মনে তাঁর উপরে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। তাই সে নরেনের পরামর্শ মত তাঁকে অগ্রাহ্য করতে আরম্ভ করল।

শনিবারে শনিবারে বিকালের দিকটা মাষ্টার মশাইয়ের ছুটি থাকত। সন্ধ্যার পর সুশীলদের বাড়ী আসতেন। এক শনিবারে নরেন বলল সুশীলকে, "আজ সন্ধ্যার পর থিয়েটারে যাবি?"

সুশীল—থিয়েটার? থিয়েটারে তো বড়রা যায়।

নরেন—আরে না না। শুধু বড়রা কেন? আমাদের মত কত ছেলে যায়, গেলে দেখতে পাবি।

সুশীল—যদি বকুনি খাই?

নরেন—কেউ জানতে পারলে তো বকবে? দরোয়ানকে মানা করে দিস্ মেসোকে বলতে।

সন্ধ্যার পর নরেন আর বিকাশ এসে সুশীলকে ভাড়া গাড়ী ক'রে নিয়ে গেল থিয়েটার দেখাতে। রাত দশটায় সুশীল বাড়ী ফিরল।

মাষ্টার মশাই জেগেই ছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন সে কোথায় গিয়েছিল। সুশীল কেবল বলল, "বেড়াতে।" এমনি পরের শনিবারেও নরেশ আর বিলাস এসে সুশীলকে নিয়ে গেল। মাষ্টার মশাই দু-চারবার দেখলেন, সুশীলের কথায় বার্তায় আঁচ করলেন সে থিয়েটারে যাচ্ছে। সুশীলকে নিজে নিষেধ করতে তাঁর ইচ্ছা হল না। তাই একদিন চন্দ্রনাথকে কথাটা জানালেন।

সব শুনে চন্দ্রনাথ বুঝলেন, সুশীল যদি এরকম ভাবে চলে, তবে সে একবারে বিগড়ে যাবে, তাঁর সম্পত্তিও নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তিনি ঠিক করলেন তাকে একটু সতর্ক করে দেবেন। বিকালে যখন সুশীল সেজেগুজে বেড়াতে বের হচ্ছে, তিনি গিয়ে তাকে বললেন, "সুশীল, আমি জানতে পেরেছি, তুমি যে এইসব ছেলেদের সঙ্গে এত ভাব করছ, এদের একটিও তেমন ভাল ছেলে নয়। এদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করলে শেষে তোমাকেই ভুগতে হবে। এত ছোটবেলা থেকে বেশী রাত পর্যন্ত বাইরে থাকতে নেই। এতে পড়াশোনার ক্ষতি, শরীরের ক্ষতি। তুমি একটু সাবধান থেকো।

কথাটা মোলায়েম ভাবেই বললেন তিনি। সুশীল তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ফেরাচ্ছিল। সে মুখ বিকৃতি করে, "আমি কার সঙ্গে মিশি না-মিশি তা নিয়ে সকলের এত মাথাব্যথা কেন?" ব'লে, চন্দ্রনাথের দিকে একেবারেই না চেয়ে গটগট ক'রে বেরিয়ে গেল। তার বুঝতে বাকি রইল না, মাষ্টারই জানিয়েছেন চন্দ্রনাথকে।

কিছুদিন থেকেই চন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন, সুশীল তাঁকে আর 'বাবা' বলে ডাকে না, তাঁকে এড়িয়ে চলে। তাঁর সঙ্গে সুশীলের বাস্তবিক তো কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই, কেবল বংশধারার সম্বন্ধ ছিল বলতে

হবে। সে সম্পর্ক যখন সুশীল মানতে চায় না, তখন তাঁরও তার উপর কর্তৃত্ব করবার কোনো অধিকার নেই। তাঁর তাদের জন্য, কর্তব্যবোধে যেটুকু করবার সেটুকু অবশ্য করবেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি চলে এলেন নিজের ঘরে। সুশীলের ভবিষ্যৎ ভেবে অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর কাছে সুনীল আর সুশীলে কোনও তফাৎ নেই। সুশীলকে তিনি নিজের ছেলের মতই ভালবাসেন।

আর সুনীল? বাড়ীতে তার বড় সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। সকালে উঠে বাবার সঙ্গে ব্যায়াম অভ্যাস করে। পরে, নিজের ঘর পরিষ্কার করা, বিছানা তোলা, স্নানের পর কাপড় কাচা, এই সবেতে লাগে। তারপর খেয়েদেয়ে, দশটার আগে স্কুলে যায়। বাবার কোনও কাজ থাকলে, কিম্বা তাঁর শরীর ভাল না থাকলে, বাজারও আনে সুনীল। সন্ধ্যাবেলাটা সুনীলের পড়াশোনার সময়। যেতে আসতে, ঘরে বারান্দায় সুশীলের সঙ্গে দেখা হয় বটে, দু-চারটে কথাও হয়, কিন্তু সুনীল নিজে থেকে পারতপক্ষে ওর ঘরে যায় না, কিম্বা ওর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে না। সুশীলও তাকে ডাকে না নিজের ঘরে, পাছে বন্ধুরা পছন্দ করবে না। পাছে তারা সুনীলকে অপদস্থ করে তাই তার ইচ্ছা হয় না। কখনও কখনও সুনীলের ঘরে গিয়ে সে পেন্সিলটা রবারটা চায়। সুশীলের পেন্সিল রবার হরদম হারায়, স্কুলে বাক্সের ভিতর থেকে কে নিয়ে যায়। স্কুলে যাবার আগে সব দেখেশুনে গুছিয়ে নেবার, হারানো জিনিস কিনে নেবার অভ্যাস তার হয় নি। খেয়ালই থাকে না।

সামান্য ভাবে থাকতে হয় ব'লে সুনীলের মনে কোনও ক্ষোভ

নেই। সন্তুষ্ট চিত্তে আছে সে। কেবল একটি কারণে তার মনে কষ্ট। অমলা যে তার নিজের মা নয়, সে কথা কেউ তাকে স্পষ্ট ক'রে বলে নি। এত কাজকর্ম করা, এত বাধ্য হয়ে থাকা সত্ত্বেও অমলার তার প্রতি স্নেহ নেই। বরং যেন ও না থাকলে ভাল ছিল, এমনি ধরণের ব্যবহার। সুনীল ভাবে, 'হয়ত অভাবে পড়ে তাঁর মন ভাল থাকে না। আমি খুব মন দিয়ে লেখাপড়া শিখব, বড় হয়ে অনেক টাকা উপার্জন করব, তা হলে মা খুশি হবেন।'

আজও দুলাল সুনীলের অবসরের সঙ্গী। পালপার্বণে তারই সঙ্গে জুটে আনন্দ করে সে। দীপালির দিন হরিহর বসুর বাড়ীর প্রকাণ্ড ছাতের আলসে ঘিরে প্রদীপ সাজানো হয়। সুনীল আর বন্ধুরা মিলে ঝুড়ি ভর্তি আতসবাজি কিনে আনে। অনেক রাত পর্যন্ত তারা হৈ-হল্লা করে। চন্দ্রনাথ সুনীলকে কিছু আতসবাজি কিনে এনে দেন। দুলালও কিছু আনে। সন্ধ্যার আরম্ভেই ছাতের বাতি একটি একটি ক'রে জ্বলে ওঠে। নীচে দরোয়ানের ঘরের দাওয়ায় এক সারি প্রদীপও জ্বলে। সুনীল আর দুলাল, দুলালদের দাওয়ায় ছোট ছোট তুবড়ি বাজি সাজিয়ে ফোটায়। দাওয়ার ধারে ধারে আগুনের গাছ যেন মাথা তোলে আর ঝ'রে পড়ে। রংমশালের লাল আলোতে দুজনের হাসিমুখ রঙীন হয়ে ওঠে। চর্কিবাজি ঘোরে। হাউই আনা বারণ, পাছে দোতলায় গিয়ে পড়ে।

নিজেদের বাজি পোড়ানো শেষ হলে, উপরে তাকিয়ে দ্যাখে তারা,—আলোর মালা খোলা বাতাসে টিপ্ টিপ্ করছে। এক একটা প্রকাণ্ড তুবড়ি ফুটছে, উঠছে, আবার নেমে যাচ্ছে। নীচে থেকে কেবল সেগুলোর অর্ধেক পর্যন্ত দেখা যায়। সাঁই সাঁই শব্দ হচ্ছে, বুঝি চর্কি-

বাজির। হুস্ ক'রে তারাবাজি লাফিয়ে উঠল, কত উঁচুতে আকাশের গায়ে রঙীন উল্কার বৃষ্টি হল যেন। সুনীল আর দুলাল নীচে থেকেই কৌতূহল মেটায়। সেই আলো ভরা উঁচু ছাতে যাবার আকাঙ্ক্ষাও করে না তারা।

সেবার কিন্তু ছাতের আগুন বাজির খেলা নেমে এল নীচে, বাড়ির উঠোনে। সিঁড়িতে পা পিছলে গিয়ে সুশীলের পা মচকে গেছে, সে ছাতে উঠতে পারবে না। কাজেই নীচে সুনীলদের বাজি পোড়ানো হচ্ছে। নরেন বিলাস এরা তুবড়ি পটকা চরকিবাজি ছুঁচো-বাজি, সব ঝুড়ি ভ'রে এনে উঠোনের এক পাশে রেখেছে। হাউইও আছে দু-চারটে। নরেনদের বাজি পোড়ানো আরম্ভ হয়েছে। সুশীল একটা চেয়ারে বসেছে, দোতলার বারান্দার রেলিংএর ধারে। সুনীল তাদের ঘরের সামনে সেই বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়েছে। দুলাল তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে এক-আধটা ফুলঝুরি জ্বালাচ্ছিল। তারপর নরেনদের বাজি দেখছিল। নরেন একটা হাউই তুলে নিল হাতে, ছাড়বে বলে। সঙ্গে সঙ্গে বিলাস দুলালকে ভয় দেখাবার জন্য ছুঁচোবাজি ছাড়ল তাকে লক্ষ্য করে। সেও চট্ ক'রে চলে গেল ঘরের ভিতর।

হঠাৎ ফুটফাট দুমদাম ভয়ানক আওয়াজ হল, আর নরেনের হাত কেঁপে যাওয়াতে হাউইটা ঠিক পথে না গিয়ে সাঁ ক'রে ছুটল দোতলার বারান্দায়। কেউ কিছু বুঝবার আগেই, সুশীল যেন আগুনের ফুলকিতে ঢেকে গেল। তার পায়ে ব্যথা, তাড়াতাড়ি সরতে গিয়ে উল্টে পড়ল চেয়ার শুদ্ধ। দেখেই, সুনীল দৌড়াল সেই দিকে। সে সুশীলকে ধ'রে তুলে দেখল, তার বিশেষ কিছু

হয় নি, জামাটা কয়েক জায়গায় পুড়ে ফুটো ফুটো হয়ে গেছে, মুখে হাতে দু-চারটা ফোস্কা পড়েছে। ততক্ষণে নরেন আর বিলাসও এসেছে উপরে। বিলাস বলতে বলতে আসছে, "কি দুষ্টু, দুলালটা। ফুলঝুরি ফেলে দিল বাজির ঢুকরিতে।"

সুনীল অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "দুলাল তো ফুলঝুরি ফেলে নি। ছুঁচোবাজি একটা গিয়ে পড়ল ঝুড়িতে।"

বিলাস—নিশ্চয় ফেলেছে ফুলঝুরি।

সুনীল—না। তুমি ছুঁচোবাজি ছেড়েছিলে তার দিকে, তাই সে ঘরে ঢুকে গিয়েছিল তখনি। তোমার ছুঁচোবাজিই একটা পড়ল ঝুড়িতে। ফুলঝুরি জ্বালানো সে অনেক আগেই বন্ধ করেছিল। আমি উপর থেকে দেখলাম।

"বটে? আমি মিছে বলছি—না?" ব'লে বিলাস মুখ লাল ক'রে ঘুষি বাগিয়ে মারতে গেল সুনীলকে। সুনীল খপ্ ক'রে ধ'রে ফেলল তার হাত। অন্য হাত দিয়ে মারতে গেল বিলাস। সুনীল সে হাতও ধরে ফেলল। বিলাস আবার মারবার ইচ্ছায় প্রাণপণে চেষ্টা করছে হাত ছাড়াতে কিন্তু পারছে না। তারপর সুনীল তার দু হাত ধ'রে, তাকে আস্তে আস্তে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে।

বিলাস ফুলতে লাগল রাগে। নরেন বলল, "কেন ওইসব বাজে লোকদের সঙ্গে কথা বলতে যাস?" সুনীল বুঝল, সুনীলের সাহস আছে, গায়ে জোরও আছে। মনে মনে গর্ব অনুভব করল সে। বিলাস মনের ঝাল মেটাবার সুযোগ খুঁজতে লাগল। দুলালের বেড়ালটা মাঝে মাঝে উপরে উঠে আসে। বিশেষত, বিকালে চায়ের

সময়টায় সে যেন নীচে থেকেই মাংসের সিঙাড়ার গন্ধ পায়। এমনি এক বিকালে, খাবার পরে বেড়াল ঢুকেছে সুনীলের ঘরে। সুনীল আর নরেন তখন চা খাওয়া শেষ ক'রে বারান্দায় গিয়ে বসেছে। বিলাসও যাচ্ছিল বেরিয়ে, বেড়ালটাকে আসতে দেখে রয়ে গেল। চায়ের দুধের যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু সে ঢেলে দিল বেড়ালের সামনে। বেড়ালটা চুক্‌চুক্‌ ক'রে খেতে লাগল দুধ। বিলাস সেটাকে খপ্‌ ক'রে ধ'রে নিয়ে ছুটে চলল বারান্দায়। বিকট ম্যাও ম্যাও ডাক শুনে সুনীল আর নরেন চমকিয়ে তাকায়। সুনীল "কি কর, কি কর" বলতে বলতে, বিলাস বেড়ালটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল দোতলা থেকে নীচের উঠোনে। বেড়ালও শূন্যের মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে চার পা পেতে পড়ল উঠোনে; খানিক স্তব্ধ থেকে ছুটে পালালো দুলালের ঘরে। তিন জনে উপর থেকে গলা বাড়িয়ে দেখছিল। বিলাসের অপ্রস্তুত হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে নরেন বিদ্রূপের হাসি হাসল। সুনীল সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল; কিন্তু বিলাস এমনভাবে অন্যায় রাগ পুষে রেখেছে দেখে বিশ্রী লাগল ওর।

এগারো

একদিন স্কুলে সুনীলের ভারি মাথা ধরল। সে অতি কষ্টে বাড়ী এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। অমনি শুনল অমলা ডাকছে, "সুনীল, সুনীল।" ঘরে এসে সুনীলকে শুয়ে থাকতে দেখে তার মা বলল, "কুঁড়ের মত বিছানায় গড়াচ্ছিস্ যে? মুদির দোকান থেকে জিনিসগুলো

এনেছিস ?” সুনীলের মনে পড়ে গেল, স্কুল থেকে বাড়ী ফিরবার পথে দোকান থেকে ময়দা আর নুন আনবার কথা ছিল। সে কিন্তু মাকে বলল না যে তার মাথা ধরেছে। ভারি অভিমান হল, ‘মা একবারও জিজ্ঞেস করলেন না কেন শুয়েছি। আমি তো কখনো স্কুল থেকে ফিরে শুই না।’ তখনি বিছানা ছেড়ে উঠে সে চলল দোকানে। কপালটা দপ্ দপ্ করছে, দুই চোখ লাল, চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছে না। পথে দুজন ভদ্রলোক আসছিলেন, সুনীল তাঁদের একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেল। ভদ্রলোকটি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, “এ কি সুনীল! তোমার মুখ কেন অমন হয়েছে? কোথায় যাচ্ছ?” সুনীল বলল, “মুদির দোকানে যাচ্ছি।” সত্যবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার মুখ কেন অমন দেখাচ্ছে? অসুখ হয়েছে কি?”

ক্ষীণ ক্ষীণ সুরে সুনীল উত্তর দিল, “বড্ড মাথা ধরেছে।” আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন সত্যবাবু, “এখন দোকানে না গেলে নয়? বাড়ী গিয়ে একটু শোও।”

সুনীল—না, এখনি যেতে হবে। মা বলেছেন জিনিসগুলো এখনি দরকার।

সত্যবাবু—চাকরদের কেউ একজন তো যেতে পারে।

সুনীল—চাকরদের পাঠাতে বাবা মানা করেছেন।

ব’লে সুনীল তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সুনীলের চাকরদের দিয়ে নিজের কাজ করাতে চন্দ্রনাথ একেবারেই চাইতেন না।

সত্যবাবু মাঝে মাঝে সুনীলের বাড়ী যান। সুনীল অমলা আর চন্দ্রনাথের কাছ থেকে এত যত্ন পায় দেখে তিনি সুখী হন। সুনীলকে সত্যবাবুর ভারি ভাল লাগে, যদিও সে কারও কাছে বড় ঘেঁষে না। সে

যে পড়াশোনায় ভাল, তা তিনি জানেন। দূর থেকে যতটা দেখেন, তার স্বভাবও শান্ত শিষ্ট বলে বুঝতে পারেন। চোখের সুন্দর চাহনিতে তার সাদা মনটি উঁকি মারে। কিন্তু তিনি দুঃখিত হন তার প্রতি অমলার ব্যবহার দেখে। গরীবের ছেলে গরীবের মত থাকে, তাতে কারো কিছু বলবার নেই। কিন্তু অনেকবার তিনি তাদের বাড়ীতে হঠাৎ গিয়ে পড়ে দেখেছেন, সুনীল মায়ের কাছ থেকে তাড়না খাচ্ছে, হয়ত সামান্য কারণেই। মাতৃহীন বালকের প্রতি মেয়েদের কোমল মন এত নিষ্ঠুর হতে পারে কি করে ? ভাবেন, 'ভাগ্যে সুশীলের জন্য হরিধন টাকা রেখে গিয়েছিলেন। নইলে সেও এমনি ব্যবহার পেত।' সুশীলের কথা ভাবতে তাঁর মনে পড়ে গেল, বছর দুই পরে সে সাবালক হবে, তখন তিনি তার হাতে সম্পত্তি দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। সুশীলকে তিনি খুবই স্নেহ করেন। তার সদাপ্রফুল্ল প্রকৃতির গুণে সে সকলেরি প্রিয়পাত্র। তার গালে-টোল-খাওয়া হাসিমুখ সকলেরি মন কেড়ে নেয়। কিন্তু তার দুর্বল মনকে বাইরের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবার মত কেউ নেই। সত্যবাবুর সময় নেই সেদিকে নজর দেবার। চন্দ্রনাথের অধিকার নেই সাবধান করবার। অমলার সঙ্গে সুশীলের আজকাল বড় সম্পর্ক নেই। মাঝে মাঝে ভাল খাবার জিনিস কিছু তৈরী করলে, সে সুশীলকে নিজের ঘরে ডেকে এনে খাওয়ায়। সেই সময়ে সুশীল আর সুনীলেও দেখা হয়, কথাবার্ত্তা হয়, তারা দুজন যে ভাই, তা তারা অনুভব করে ; অন্ততঃ সুনীল করে।

সুশীল যখন সাবালক হল, সত্যবাবু এসে সমস্ত সম্পত্তি তার হাতে তুলে দিলেন ; বললেন, "চন্দ্রবাবুর বয়স হয়েছে, তিনি এত হিসাবপত্র রাখতে পারবেন না হয়ত। তোমার আয়ব্যয়ের হিসাব রাখার,

সম্পত্তির সব দিকের দেখাশোনা করার জন্য একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করে দেন। আর আমিও মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নেব।'

কিন্তু চন্দ্রবাবুর সে বাড়ীতে থাকা সম্বন্ধে কোনও কথা উঠল না। সত্যবাবুর ধারণা, চন্দ্রনাথ যখন সুশীলের মেসোমশাই, যদিও একটু দূর সম্পর্কের, তখন সুশীল নিশ্চয় তাঁকে কাছে রাখতে চাইবে।

সুশীলের সঙ্গীরা এবার তার ঘাড়ে চেপে বসল। ভোজের আয়োজন, তাশের আড্ডা, গল্পগুজব লেগেই রইল। পড়াশোনা চুলোয় গেল। বন্ধুরা সুশীলকে বোঝায়, "তোর কষ্ট ক'রে লেখাপড়া শিখবার দরকার কি? চাকরী তো করতে হবে না।" মাষ্টার মশাই সঙ্গে সঙ্গে বিদায় হয়েছেন। আমোদ প্রমোদের সমস্ত খরচ অবশ্য যায় সুশীলের টাকা থেকে।

এমন যে হবে তা চন্দ্রনাথ আগে থেকেই আশঙ্কা করেছিলেন। সে বাড়ীতে তাঁর থাকবার এখন আর কোনও দরকার নেই। তবু নিজ মুখে কিছু বলতে পারছিলেন না। সুশীলকে এই সব মন্দ ছেলেদের মাঝে অসহায় ভাবে একলা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। জেনেশুনে কি তিনি স্নেহের ধনকে ডুবিয়ে দিতে পারেন? হাজার হোক, সুশীল এখনও ছেলে মানুষ। বন্ধুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করবার তার সাহস নেই।

ম্যানেজার যিনি এলেন, তিনি প্রথম মাসে চন্দ্রনাথকে মাসহারার টাকা দিলেন। এই ম্যানেজারটি ছিলেন বিলাসের এক আত্মীয়ের বন্ধু। দ্বিতীয় মাসে বিলাস গিয়ে সুশীলকে বলল, "ম্যানেজার বলছিলেন, তোর মেসো তো এখন তোর কোনও কাজ করে না, তবে কেন মাসহারা দেওয়া হবে?"

সুশীল প্রথমে কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না, বলল, "আগে তিনি যেমন করতেন, এখনও তো তেমনি করছেন।"

বিলাস—কি আর করছে ? টাকাপয়সার ব্যাপার তো ম্যানেজার বোঝে। ঝি-চাকরে ঘরের কাজ করে। মেসোকে মাসে মাসে টাকা না দিতে হলে অনেক টাকা বেঁচে যাবে।

পরদিন ম্যানেজারের কাছে সুশীল নিজেই কথাটা পাড়ল। তিনি বললেন, "আমার মনে হচ্ছিল তাই বললাম। একজনের জন্য যা খরচ হওয়া উচিত তার চেয়ে বেশী খরচ হচ্ছে বোধ হয়।

সুশীল—আচ্ছা, ভেবে দেখব।

ভাববে আর কি ? বন্ধুদের পরামর্শেই তো সে চলে। সন্ধ্যাবেলা বন্ধুরা অনেক পরামর্শ দিল,—টাকা কি অমন সস্তা ? মেসো তো একলা নয়। অমলা আছে, সুনীল আছে। কিসের জন্য সুশীল তিন তিন জনকে পুষবে ? ইত্যাদি।

সুশীলের কিন্তু একবারও মাথায় এল না যে, বেশী খরচটা হচ্ছে তার বন্ধুদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদে।

অনেক ভেবেচিন্তে শেষটায় সুশীল চন্দ্রনাথকে বলল, "ম্যানেজার বলছিলেন, আজকাল টাকার টানাটানি পড়েছে। তিনি তোমার টাকা যোগাতে পারছেন না। তুমি অন্য বাড়ী দেখ।" বলেই, মুখ ফিরিয়ে চলে গেল, বোধ হয় অস্বস্তির ভাব ঢাকবার জন্য। তার মনে বিবেক খোঁচা দিচ্ছিল বই কি।

সুশীল ম্যানেজারের নাম করে বলল বটে, কিন্তু নিজের মুখেই তো বলল। এর পরে আর এ-বাড়ীতে থাকা চলে না। চন্দ্রনাথ তখনি বেরিয়ে গেলেন বাড়ী খুঁজতে। তাঁর আগের কাজ তিনি

ছাড়েন নি। একেবারে সুশীলের ভরে প্রতিপালিত হতে তাঁর মন চায় নি। যে সামান্য টাকা তিনি অফিস থেকে পান, তাতে কলকাতা শহরে তিনজনের খাওয়া-পরা অবশ্য চলা মুস্কিল; কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বন্ধুরা সুশীলকে একলা পেয়ে, কোন্ সর্বনাশের পথে তাকে টেনে নিয়ে যাবে কে বলতে পারে? এই চিন্তা তাঁকে অস্থির ক'রে তুলল। অমলাও যখন খবরটা শুনল, মনে আঘাত পেল। সে বাস্তবিকই ভালবেসেছিল সুশীলকে।

সুশীলের বন্ধুদের দু-একটা কথা যা তার কানে এসেছিল, তা থেকে সুনীল সন্দেহ করেছিল এই রকম কিছু ঘটবে। সুশীলের প্রতি তার মমতার অন্ত ছিল না। তার একটি মাত্র ভাই সে। তাদের দুজনের মাঝখানে প্রাচীরের মত যে বাধা দাঁড়িয়েছিল, সে বাধাকে অতিক্রম করতে সুনীলের শক্তি ছিল না। যে ভাবনা চন্দ্রনাথকে অস্থির করছিল, সুনীলের মনকেও সেই ভাবনা আচ্ছন্ন করল।

চন্দ্রনাথ অন্য বাড়ীতে যেতেই, নরেন আর বিলাস সুশীলের সঙ্গে দিন-রাত থাকবার বন্দোবস্ত করে নিল। তারা তাকে বোঝাল, "তোর এত টাকা, একলা থাকা ঠিক নয় তোর; চোর ডাকাত লুটপাট করবে। চাকরদের বিশ্বাস কি?" সুশীলের কাছে বাড়ীটা এখন বড্ড খালি খালি লাগে। একলা থাকতে ভয়ও করে একটু। তাই সে খুশি হয়েই নরেনদের তার কাছে থাকতে বলল। নরেনের অভিভাবক কেউ নেই। সে বরাবরের ব্যবস্থা ক'রে নিল। বিলাস মাঝে মাঝে বাড়ী যায়, রাত্রে থাকে সুশীলের কাছে। তার বাবা নেই, অন্য ভাইবোন আছে। মাকে সে বুঝিয়েছে, সুশীল তাকে ছাড়তে চায় না। খরচের কিছু সুরাহা হবে ভেবে মাও রাজি হয়েছেন।

বারো

চন্দ্রনাথ আবার গলির ভিতরের সেই ছোট্ট বাড়ীটায় এসেছেন। এখন সুনীলকে ঘরের আরও অনেক কিছু কাজের ভার নিতে হয়েছে। তাই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। পড়াশোনা চালাবার পয়সাই বা কোথায়? সবে মাত্র কলেজে ঢুকেছিল। কত আশা ছিল তার মনে, নিজের উন্নতি করবে, মা-বাবার দুঃখ ঘোচাবে। সব আশায়, জলাঞ্জলি দিতে হল। অমলা এখন আর সুনীলকে কথায় কথায় বকে না, কারণ সে না হলে যে তার কাজ চলে না।

সুশীল এমনভাবে তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করাতে, চন্দ্রনাথ মর্মাহত হয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে তো তিনি তাকে ফেলতে পারেন না। রোজ আফিসে যাবার সময়ে এবং সেখান থেকে ফিরবার সময়ে তিনি তার খবর নিতেন। কদাচিৎ তার সঙ্গে দেখা হত। বেশীর ভাগ সময়ে চাকরদের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে চলে আসতেন। সময় পেলে সুনীলও কখন কখন যেত।

সেদিন আফিস থেকে জ্বর নিয়ে ফিরলেন চন্দ্রনাথ। এক সপ্তাহ আফিস কামাই করতে হল। কাজের ক্ষতি হবে ভয়ে পরের সপ্তাহে জ্বর গায়েই গেলেন আফিসে। সেখানেই জ্বর বেড়ে যাওয়াতে, অতি কষ্টে বাড়ী এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে, চোখে দৃষ্টি নেই, মুখে কথা নেই, অচেতনের মত রইলেন। অমলা আর সুনীল দুজনে দিনরাত সেবা করছে। পাড়ার ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ওষুধ এনে খাওয়ানো হয়েছে তাঁকে।

আজ, জ্বরের একটু উপশম হয়েছে, চন্দ্রনাথ উঠে বসেছেন।

ডাক-পিয়ন দরজায় এসে ডাকল 'চিঠি—'। সুনীল চিঠিখানা এনে দিয়ে গেল বাবার হাতে। কটকের ডাকঘরের ছাপ দেখে তাড়াতাড়ি তিনি চিঠি খুললেন—তাঁর শালা অবিনাশের চিঠি। সে লিখেছে, তার মা, অর্থাৎ চন্দ্রনাথের শাশুড়ি, পনের দিন হল দেহত্যাগ করেছেন। অবিনাশ একটা দরকারে শীঘ্র কলকাতায় আসছে, শুক্রবারে কটক থেকে বেরোবে। রবিবার বিকালে তাঁর কাছে আসবে। ততদিনে কটক থেকে কলকাতা পর্যন্ত রেলগাড়ী চলাচল আরম্ভ হয়েছে। চন্দ্রনাথ হিসাব করলেন, 'পরশু, রবিবার বিকালে অবিনাশ দেখা করতে আসবে।' সুনীলকে তিনি ডাকলেন। সে এখন বড় হয়েছে, এখন তার নিজের মায়ের কথা তাকে জানানো দরকার। বিশেষতঃ অবিনাশের ঠিক পরিচয় সুনীলকে দেবেন বলে চন্দ্রনাথ স্থির করলেন।

সুনীলের সঙ্গে সঙ্গে অমলাও এল ঘরে—চন্দ্রনাথের জন্য একটা বাটিতে দুধ আর সাবু নিয়ে। ভাবনা চিন্তায় অমলার চেহারা খারাপ হয়ে পড়েছে, চোখ বসে গেছে, গাল ভেঙে গেছে। আগেকার সে হাসিখুশি ভাবও আর নেই। ঠিক কেমন ক'রে কথাটা পাড়বেন, চন্দ্রনাথ বুঝতে পারছেন না। বিছানার উপরেই অবিনাশের চিঠিখানা ছিল। অমলা চিঠি গুছিয়ে তুলে রাখবে ব'লে হাতে নিয়ে, অপরিচিত হস্তাক্ষরের প্রতি দৃষ্টি পড়ল। জিজ্ঞাসুভাবে চন্দ্রনাথের দিকে চাইল সে। আপিসের চিঠি আপিসেই যায়, বাড়ীতে আসে না। বাড়ীতে যে চিঠি আসে, অমলাই অনেক সময়ে স্বামীকে পড়ে শোনায়। আর, চিঠিও সদাসর্বদা আসে না, কেন না চিঠি লিখবার লোক বেশী নেই।

অমলা চিঠিখানা দিতে চন্দ্রনাথ বললেন, "কটকের চিঠি, অবিনাশ লিখেছে। অবিনাশকে মনে আছে বোধ হয়?"

অমলা—আছে। হঠাৎ এতদিন পরে চিঠি কেন? কখনও তো লেখে না?

চন্দ্র—লিখেছে, আজ দিন পনের আগে তার মা মারা গেছেন। সে কলকাতায় আসছে কাজে। পরশু আমার সঙ্গে দেখা করবে।

"ও" ব'লে সাবুর বাটি বিছানার পাশে তেপায়ার উপরে রেখে অমলা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

চন্দ্রনাথ সুনীলকে কাছে টেনে এনে বিছানায় বসালেন। সুনীল একটু অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, "ডাকছিলে?"

চন্দ্র—হ্যাঁ বাবা, ডাকছিলাম।

বাবা আর কিছু বলছেন না, চুপ করে আছেন দেখে সুনীল সাবুর বাটিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "সাবু ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বাবা, খেয়ে নাও আগে।"

সাবু খাওয়া হলে, সুনীলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে চন্দ্রনাথ বললেন, "সুনীল, বাবা, পৃথিবীতে অনেক ঘটনা ঘটে যার আঘাতে মানুষের জীবনটাই বদলে যায়। তেমনি এক বিপর্যয় এসেছিল তোর আর আমার জীবনে। এতদিন তোকে বলি নি, ছেলেমানুষ ছিলি, তাই। এখন বলব।"

তারপর খানিক চুপ থেকে, হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই তোর মাকে ভালবাসিস্—না?" এ প্রশ্নে একটু আশ্চর্য হয়ে সুনীল বলল, "বাসি বই কি। কেন বাবা? কিছু দোষ করেছি কি?"

চন্দ্র—না না, কোনই দোষ করিস নি। ভালবাসিস তা জানি। এখন আমি যা বলতে যাচ্ছি, তা শুনে তুই যেন সে ভালবাসা ভুলে যাস্ না। তবে শোন্। অমলা তোর নিজের মা নয়।

চন্দ্রনাথ সুনীলের পিঠে হাত রেখেছিলেন, বুঝতে পারলেন সে চমকে উঠল। চমকে উঠে তখনি অত্যন্ত বিস্মিতভাবে চাইল চন্দ্রনাথের মুখের দিকে। তিনি বলে চললেন, "তোর নিজের মা ছিলেন নিরজা। তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হয় প্রথমে। কিন্তু তাকে আমরা হারালাম।" সুনীল কোলের উপর দু হাত রেখে ব'সে মন দিয়ে শুনছিল। চন্দ্রনাথ বলে চললেন, "তোর দিদিমা, নিরজার মা, থাকতেন কটকে। আমিও তখন কটকে কাজ করতাম। তারপর কলকাতার এই আফিসে চলে এলাম। কটকেই তোর জন্ম হল। আমি তখন এখানে। নানা কারণে, তোর মায়ের তোকে নিয়ে কলকাতায় আসতে দেরী হল। তখন কটক থেকে কলকাতায় জাহাজে ক'রে আসতে হত। তারপর, ওখানের একটি লোকের সঙ্গে তোর মা তোকে আর সুশীলকে নিয়ে এখানে আসবার জন্য জাহাজে ওঠে। কিন্তু, কলকাতার কাছাকাছি এসে ঝড়ে প'ড়ে জাহাজখানা ভেঙে যায়, যাত্রীরা নৌকোয় ওঠে। অনেকগুলো নৌকো ছিল। তুই ছিলি মায়ের সঙ্গে এক নৌকোয়। সে নৌকো ডুবে গেল।—তোকে জেলেরা তুলে আনল,—তোর মাকে পেল না।"

বাবার কাছে সবই শুনল সুনীল। সে জানত তার বাবা সুশীলের মেসোমশাই, অমলা মাসিমা। এখন জানল, অমলা সুশীলের কেউ নন, তাঁদের প্রতি সুশীলের ব্যবহারের একটা কৈফিয়ত যেন সে খুঁজে পেল। বন্ধুরা এ খবর তাকে কি দিয়ে থাকবে না? 'বেচারী

সুশীল। এ পৃথিবীতে সুনীল ছাড়া তার আর আপন জন বলতে কেউ নেই। সুশীল আর সুনীল, দুই ভাই জাহাজে আসছিল সুনীলের মায়ের সঙ্গে। কল্পনায় আনতে চেষ্টা করল সুনীল সেই জাহাজ, সেই ঝড়ের রাত। অনেক দূরের অতীতের স্মৃতি খুঁজে মায়ের মুখ মনে করতে চাইল। অস্পষ্ট কিছুও মনে পড়ে না। হায়, একটু ছায়াও যদি থাকত তার মনে।

এতদিনে সুনীল তার প্রতি অমলার স্নেহহীন ব্যবহারের তাৎপর্য বুঝল। অমলার জন্য কেমন একটা করুণা বোধ করল সে। ছেলে-মেয়ে তাঁর হয় নি। সুনীল নিজের ছেলে নয়। নিশ্চয় তিনি দুঃখে আছেন। তিনি স্নেহ না করলেও, সুনীল তাঁর সঙ্গে ছেলের মত ব্যবহার করবে।

তেরো

নীচে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত সুনীল, কিন্তু বাবার যে অসুখ। তাই রবিবার বিকালে দোতলার বারান্দায় অধীর আগ্রহে অবিনাশের আসার অপেক্ষা করল সে। মায়ের সঙ্গে মামার চেহারার সাদৃশ্য থাকবে কি? মায়ের সম্বন্ধে তিনি কিছু বলবেন কি? এই রকম কত প্রশ্ন তার মনকে তোলপাড় করছে। অবিনাশ এসে সুনীলের দিকে এগিয়ে গেল হাসতে হাসতে। সুনীলও নীচু হয়ে পায়ের ধুলো নিল। প্রণাম সেরে উঠতে, তার মুখের দিকে চেয়ে অবিনাশ ভাবল, 'বয়স বেড়ে আশ্চর্য সাদৃশ্য হয়েছে বাপের সঙ্গে।' তারপর গেল সে

চন্দ্রনাথের কাছে। তিনি বিছানায় শুয়েছিলেন। অবিনাশকে দেখে উঠে বসলেন। বিগত সুখের কত স্মৃতি তাঁর মনে ভীড় ক'রে এল; হারানো ছেলের শোক নতুন করে জেগে উঠল। সেই নৌকোডুবির পর অবিনাশের সঙ্গে আর চন্দ্রনাথের দেখা হয় নি। অবিনাশও কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে লাগল।

সুনীলকে তাঁরা ডাকেন নি, তাই সে ঘরে আসে নি। কিছুক্ষণ পরে, একটু সামলিয়ে নিয়ে অবিনাশ বলল, "সুশীলকে দেখলাম বারান্দায়।"

"সুশীলকে? সুনীল বল।" বললেন চন্দ্রনাথ। অবিনাশ যেন বুঝতে পারছে না এমনি ভাবে চেয়ে রইল। পরে বলল, "বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সুশীল না?"

চন্দ্র—না না, সুশীল কেন হবে? ও তো আমার ছেলে সুনীল। অনেক বড়ো হয়ে গেছে কিনা, চিনতে পারছ না। কত ছোটটি দেখেছিলে।

অবিনাশ যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল, জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা বলুন তো কেমন ক'রে আপনি সুশীলকে পেলেন। আমাদের তো এসব বিষয়ে বিশেষ কিছুই লেখেন নি।"

চন্দ্র—তখন কি আমার মাথার ঠিক ছিল? ভাবতেই পারছিলাম না কি যে হয়ে গেল, তার লিখব কি।

তারপর চন্দ্রনাথ অবিনাশকে সব বললেন,—কেমন ক'রে জাহাজ ঘাটে গিয়ে যদুর কাছে একটি ছেলে পেলেন, আর নৌকাডুবির খবর পেলেন; কেমন করে সেই ছেলেটির গলার হারের লকেটের ফটো দেখে তিনি আর সত্যবাবু বুঝতে পারলেন সেটি কৃষ্ণধনের ছেলে—

নইলে বুঝবার উপায় ছিল না। আবার এক বছর পরে যদুর কাছ থেকে কি করে সুনীলকে পেলেন তাও বললেন। আগের ছেলেটি যখন কৃষ্ণধনের, তখন এ ছেলেটি তাঁরই বলে তিনি ধরে নিলেন। সন্দেহের কোনও কারণ ছিল না।

বিষম ভাবনায় পড়ল অবিনাশ। বাসুবাবুর ছেলে যখন কটকে যায়, তার গলার হারের লকেট সবাই খুলে দেখেছিল। অবিনাশও দেখেছিল। সুনীলের চেহারা আর লকেটে কৃষ্ণধনের চেহারায় খুব মিল আছে ব'লে মনে হচ্ছিল তার। অথচ লকেট ছিল অন্য ছেলেটির গলায়। সে জিজ্ঞাসা করল, "সুনীল কোথায়? তাকে একবার দেখতে পারি?"

সুনীলের বাড়ীর ঠিকানা চন্দ্র অবিনাশকে দিলেন, বললেন, "কাল সকালে গেলে দেখা পেতে পার। আমার শরীর ভাল থাকলে আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। সত্যবাবুও নেই এখানে। তিনি কি কাজে কিছু দিনের জন্য পাটনায় গেছেন। তাঁর সঙ্গেও দেখা করলে ভাল ছিল। আমার বিশ্বাস, সুনীলকে দেখলে, তোমার সন্দেহ দূর হবে।"

এর পরে অবিনাশ আর বেশীক্ষণ বসল না। চন্দ্রনাথ সুনীলকে ঘরে ডাকলেন। তার চিবুক তুলে ধরে আদর করে অবিনাশ বলল, "কত বড় হয়ে গিয়েছিস্, এঁ্যা, সেই কতটুকুন ছিলি যখন দেখে ছিলাম।" আর বেশী কিছু বলতে সাহস পেল না। "কাল আবার আসব" বলে সে চলে গেল।

পরদিন বিকালে অবিনাশ এসে চন্দ্রনাথের বিছানায় হতাশ ভাবে বসে পড়ল। সুনীলকে সে বলল, "সুনীল, আমার জন্য এক পেয়ালা

চা আনতে পারিস্?"

সুনীল চলে গেল চা আনতে। অবিনাশ বলে উঠল, "এতে আর কিছু ভুল নেই। এইটিই সুশীল, অর্থাৎ কৃষ্ণধন বসুর ছেলে। যাকে আজ সকালে দেখে এলাম, সে আপনার ছেলে সুনীল। সুশীলের রং ছিল ফর্সা, মাথার চুল কোঁকড়ানো, চোখ দুটি বড় বড়, ঠিক এই যাকে সুনীল ডাকছেন আপনারা, তার মত। আশ্চর্য! আপনি তো লকেট দেখেছিলেন—আপনার কি খেয়াল হয় নি?"

চন্দ্র—লকেটটাই প্রমাণ বলে আমি সেটা সত্যবাবুকে আগেই দিয়ে দিয়েছিলাম। ছোটবেলায় চেহারার এত খুঁটিনাটি বোঝা যায় নি।

অবিনাশ—তা হলে সত্যবাবু ফিরলে, আপনি চেয়ে এনে দেখবেন। আমার কোনই সন্দেহ নেই। আপনার ছেলেকে যাকে এখন সুশীল বলছেন—দেখেও আমার মনে সন্দেহ রইল না যে সেই আমার দিদির ছেলে। দিদির মতই তার মুখের গড়ন, আর বাঁ গালে টোল খায়। আপনি কি নজর করেন নি?

চন্দ্র—টোল খায় নজর করেছিলাম। তবে আর কোন সাদৃশ্য আমার চোখে ধরা পড়ে নি। তাই তো—এ তো বড় মুস্কিল হল। তবে আমার পক্ষে এতে কিছু এসে যাবে না। কেননা আমি দুটিকেই নিজের ছেলের মত দেখি, সমান ভালবাসি।

অবিনাশ—আমি এখন যাই। ট্রেন ধরতে হবে। সত্যবাবু এলে কি মীমাংসা করেন আপনারা আমাকে জানাবেন।

তারপর অবিনাশ বিদায় নিল।

চন্দ্রনাথের জ্বর টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছে। সত্যবাবু পাটনা থেকে

যখন ফিরলেন, তখনও তিনি সুস্থ হন নি। সন্দেহ আর অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। মুখে বলেছিলেন বটে, সুনীল না হয়ে সুশীল যদি তাঁর ছেলে হয়ে থাকে, তবে তাতে কিছু এসে যাবে না, কিন্তু যতই চিন্তা করতে লাগলেন ভবিষ্যতে কি রকম দাঁড়াবে, ততই এটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এতে সুনীলের লাভ, সুশীলের ভয়ানক ক্ষতি। হরিধন বসুর বিষয়-আশয় সুনীলের হবে, সুশীল দারিদ্র্যের মধ্যে পড়বে। তার কষ্ট করে থাকা অভ্যাস হয় নি, স্বভাবও বিগড়ে যাচ্ছে। কি দুর্দশায় পড়বে সুশীল অনুমান ক'রে তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন।

চন্দ্রনাথ মনস্থ করলেন, বিষয়টা এখন সত্যবাবুকে জানাবেন না। তন্ন তন্ন ক'রে সমস্ত অনুসন্ধান করবেন। কৃষ্ণধনের ছবি দেখে তিনি কিছু বুঝতে পারলেও, সত্যবাবুকে সে কথা বলবেন না। কেবল নিজে গিয়ে সত্যবাবুর কাছে ছবিখানা দেখে আসবেন। এই মনে ক'রে রবিবারে অসুস্থ শরীরেই তিনি রওনা হলেন সত্যবাবুর বাড়ী। একথা-সেকথার পর, অবিনাশের আসার সংবাদ দিলেন। তারপর বললেন, "অবিনাশ জিজ্ঞাসা করছিল, সুশীলের গলায় যে হার আর লকেট ছিল, তা কোথায়। সে হার তো আমি আপনাকে দিয়েছিলাম না?"

সত্যবাবু—হাঁ। আমার কাছেই আছে। নিয়ে যান না, ও দিয়ে আর কি কাজ হবে?

চন্দ্রনাথ—না না, আপনার কাছেই থাক। আচ্ছা, লকেটটায় কি কিছু লেখা ছিল?

সত্যবাবু—কই, না তো। আমি আনছি, আপনিই দেখুন।

ব'লে তিনি অন্য ঘরে গেলেন। একটু পরে হার নিয়ে ফিরে এলেন। চন্দ্রনাথ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেন হারের জন্য। লকেটটা খুললেন। কৃষ্ণধনের মুখের দিকে চাইতেই, সে মুখের উপর ভেসে উঠল আর একটি মুখ—সুনীলের মুখ! কাঁপতে কাঁপতে তিনি বসে পড়লেন চেয়ারের উপর। সত্যবাবু তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে ধরে না ফেললে, বুঝি মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। অনেকক্ষণ টেবিলে হাতের উপর মাথা রেখে হেঁট হয়ে থাকবার পর চন্দ্রনাথ মাথা তুলে ম্লান হাসি হেসে বললেন, "আরে আরে শরীরটা মাটি হয়ে গেছে।"

সত্যবাবু—একটু এখানে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম ক'রে নিন, তারপর বাড়ী যাবেন'খন।

চন্দ্রনাথ—না না, তেমন কিছু না। খালি একটা গাড়ী ডেকে দিলেই হবে।

চোদ্দ

চন্দ্রনাথের খাওয়া ঘুম ছুটে গেল। দিবারাত্র এই চিন্তা,—কি করে? কি করা উচিত? সুনীল যে কৃষ্ণধনের ছেলে, সে সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহ নেই। কিন্তু পাকাটা প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কি কিছু করা উচিত? এতবড় একটা সমস্যার সমাধান কি কেবল ছবি দেখে হবে? কোনও সম্পর্ক যাদের মধ্যে নেই, তাদের মুখেও তো কখনো কখনো আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। এই ছবির প্রমাণ দেখেই তাঁরা সুনীলকে সম্পত্তি দিয়েছেন। কই হার আর লকেট

কেমন ক'রে সুনীলের গলায় গেল, তা জানতে পারলেই সব গোল মেটে। কিন্তু কে জানে সে কথা ? কে বলতে পারবে ? অবিনাশকে লিখবেন ? না, তাকে এখন কিছু বলা হবে না। সত্যবাবুকেও না।

সোমবার আফিস থেকে ফিরে চন্দ্রনাথের খুব জ্বর এল। তিনি অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়লেন। দশ-বারো দিন কেটে গেল, জ্বর ছাড়ল না। মাঝে মাঝে যখন একটু জ্ঞান হয়, চন্দ্র দেখেন, সুনীল কাছে ব'সে আছে, হয় বাতাস করছে নয় মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। নয় তো পা টিপে দিচ্ছে।

এমনি এক সন্ধ্যাবেলা চন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে ডাকলেন, "বাবা সুনীল।" সুনীল কাছেই ছিল, উত্তর দিল, "কি বাবা ?"

"এ দিকে আয়, কথা আছে।"

সুনীল বিছানার পাশে এসে বসল। তিনি তার মাথায় হাত রেখে বললেন, "আমি যদি তোর প্রতি খুব একটা অন্যায় ক'রে ফেলি, তুই আমায় ক্ষমা করতে পারিস্ ?"

সুনীলের কান্না এসে পড়ল, সে বলল, "অমন কথা কেন বলছ ?"

চন্দ্রনাথ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "সত্যিই যে আমি তোর কাছে মহা অপরাধী, ভুল বশে আমি যে তোর মহা অনিষ্ট করেছি, তাই বলছি।"

আবেগে তাঁর দুর্বল শরীর থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল। তাঁর ভাব দেখে ভয় পেয়ে গেল সুনীল। মনে করল, তার বাবা বুঝি প্রলাপ বকছেন। তাই সে ব্যস্ত হ'য়ে বলে উঠল, "তুমি চুপ করে শোও তো, অমন করলে যে জ্বর বাড়বে।"

"তা হোক। আজই বলে ফেলি। পরে হয়তো বলতে পারব না।

শোন্ ; তুই আমার ছেলে নস্, সুশীল আমার ছেলে। তুই কৃষ্ণধনের ছেলে। তার সব সম্পত্তি তোর।" বলে তিনি থামলেন।

সুনীল এ সবের মানে বুঝতে পারছে না, এখনও ভাবছে—প্রলাপ ছাড়া আর কি? ক্রমে চন্দ্রনাথ একটু দম নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন, "নৌকা ডুবির কথা তোকে বলেছি—তোকে বা সুশীলকে আমি মোটে দেখি নি তার আগে।—কৃষ্ণধন ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে যাঁরা তাদের ছেলেকে নিয়েছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন, কৃষ্ণধনের ছেলের গলায় সোনার হার আর লকেট ছিল, লকেটে তার বাবা-মার ছবি ছিল। সুনীলকে যখন আমি পেলাম তখন—কেমন ক'রে জানি না—তার গলাতেই সেই হার ছিল, এইতেই যত গোল হল। সেদিন অবিনাশ এসে দেখেই তোকে চিনেছিল কৃষ্ণধনের ছেলে ব'লে। তার কথায় সত্যবাবুর কাছ থেকে লকেট নিয়ে আমি দেখে এলাম—তাতে তোর বাবার ছবি, অবিকল তোর মত। তুই একবার সত্যবাবুকে ডেকে আন্।" একটা একসঙ্গে বলাতে ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজলেন তিনি।

চন্দ্রনাথ ঘুমোলে সুনীল আস্তে আস্তে উঠে বারান্দায় এসে মেঝেতে বসে পড়ল। তার যেন দাঁড়াবার জায়গা নেই, পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে গেছে এমনি বোধ হল। আপনা কেউ নয়, চন্দ্রনাথ বাবা নন, পৃথিবীতে সে নিতান্তই একলা। কেবল ঘটনার স্রোতে ভেসে চলেছে।

রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এল না সুনীলের। লকেটটা দেখবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ হল। কল্পনায় সে অনুভব করতে চাইল, তার মা-বাবা স্বর্গ থেকে তার দিকে চেয়ে আছেন। ঘুমের ভিতরে যেন তাঁরা জেগে রইলেন তার পাশে।

চন্দ্রনাথের অসুখ ক্রমে বেড়েই চলেছে। এদিকে ঘরে পয়সা নেই, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা কি করে হয়? সুনীল একটা দোকানে কাজ নিল। দুপুর বেলাটা দোকানে থাকতে হয়; সামান্য মাইনে দেয় তারা। তাই মেনে নিয়েছে। তবু তো সকালে বিকালে বাড়ীর কাজের সময় পাবে, রোগীর সেবার সময় পাবে।

মাসের শেষে মাইনে নিয়ে দোকান থেকে ফিরছে সুনীল, পথে দুলালের সঙ্গে দেখা। তাকে ডেকে সে সুশীলের খবর নিলে। দুলাল বললে, "দাদাবাবুর ক'দিন থেকে সর্দিজ্বর হয়েছে। সন্ধ্যার পর সুনীল গেল সুশীলের বাড়ী। আজ আর ঐ বাড়ীতে ঢুকতে তার সঙ্কোচ বোধ হল না, ভয় হল না কে কি বলবে। নতুন চোখে দেখল আজ বাড়ীখানাকে।

সুশীল ঘরেই শুয়েছিল। সুনীলকে দেখে সে খুশি হল যেন। সুনীল একটু ইতস্তত: ক'রে জিজ্ঞাসা করল, "নরেন বিলাস এদের দেখছি না?" সুশীল উত্তর দিল, "ওরা থিয়েটারে গেছে।" তারপর বন্ধুদের হয়ে কৈফিয়ত দিয়ে বলল, "তিনখানা টিকিট কেনা হয়ে গিয়েছিল। আমি তো যেতে পারলাম না। মিছিমিছি আরও দুখানা টিকিট কেন নষ্ট হবে ব'লে ওরা গেল।"

টিকিট অবশ্য কেনা হয়েছিল সুশীলের টাকায়। বহুদিন পরে সহজভাবে কথাবার্তা বলল দুই ভাই। সুনীল জিজ্ঞাসা করল, "মাসিমা মেসোমশাই কেমন আছেন?"

"বাবার শরীর খুবই খারাপ। জ্বর মোটে ছাড়ে না।" শুনে দুঃখ প্রকাশ করল সুশীল; কিন্তু টাকা দিয়ে সাহায্য করবার কথা কিছু তুলল না। সুনীল ভাবছিল হয়তো বলবে ও।

সুশীলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, বারান্দায় বেরিয়ে এসে রেলিং ধ'রে দাঁড়াল সুনীল। এই বাড়ীতে তার বাবা তাঁর শৈশব কাটিয়েছেন, যৌবনে পা দিয়েছেন। এই ঘর, এই বারান্দা কত শতবার তাঁর পায়ের চিহ্ন ধরেছে। এমনি করে হয়তো রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়েছেন তিনি। সে আস্তে আস্তে রেলিংয়ের গায়ে হাত বুলোতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে চলতে লাগল বারান্দায়, যেন বাবার পায়ে পায়ে চলার ইচ্ছা। সামনে বকুলগাছের পিছনে চাঁদ উঠেছে। তখনও কি এখানে বকুলগাছ ছিল? হয়তো ছিল, হয়তো বা অন্য কোনও গাছ ছিল। সেই গাছের পিছন দিয়ে এমনি করেই চাঁদ উঠত, এমনি করেই জ্যোৎস্না ঝরত উঠোনে। বাবাও হয়তো এইখানে দাঁড়িয়ে এমনি দৃশ্য দেখতেন চোখে। কি এক বিষাদ-ভরা তৃপ্তি তার মনকে ছেয়ে ফেলল।

পনেরো

অবশেষে অমলা আর সুনীলের একবেলা খাওয়া আরম্ভ হল। আর একবেলার খাওয়ার পয়সায় কিছু কিছু ওষুধ কেনা হয়। কিন্তু এমনি ক'রে আর কদিন চলে? কেবল তো ওষুধ নয়, রোগীর পথ্য আছে, ছোটখাট খরচ আছে। ডাক্তারখানাই বা কত দিন ধারে ওষুধ দেবে? তারা বলল, সব দাম মিটিয়ে না ফেললে আর ওষুধ দিতে পারবে না। সুনীল বাড়ী এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

অমলা শুনল সব। সে নিজের গলার বিছে হার খুলে সুনীলের

হাতে দিয়ে বলল, "এইটে বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়ে এস।"

"বন্ধক কেমন করে দেয়, কোথায় দেয় তা তো আমি জানি না। মুদীর দোকানে যাব কি?"

"এক কাজ কর। তুমি সত্যবাবুর কাছে গিয়ে আমার নাম করে বল, তিনি এই হারটা রেখে কিছু টাকা ধার দিলে, আমাদের বড় উপকার হয়।"

বছরখানেক হল অমলার বাবা মারা গিয়েছেন। তার ভাইদের অবস্থা ভাল নয়। সেইজন্য সে সেখানে হাত পাততে চায় নি।

সুনীল হার নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। তখন টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছে। সে তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলল, এবং একটু পরেই সত্যবাবুর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হল। সত্যবাবু তখন বাইরের ঘরে বসেছিলেন। সুনীল ঘরে ঢুকতে, একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "সুনীল যে! এই বৃষ্টিতে! এস এস, অনেক দিন তোমায় দেখি নি। আমাকেও ইদানিং বার বার মফঃস্বলে যেতে হয়েছে, তাই তোমাদের খবর নিতে গিয়ে নিতে পারি নি। সব ভাল তো?"

সুনীল তার হাতের কাগজ-জড়ানো হারগাছা সত্যবাবুর পায়ের কাছে রেখে বলল, "মা বললেন, এইটা নিয়ে আমাদের কিছু টাকা যদি ধার দেন, বড় উপকার হয়। আমাদের ভয়ানক দরকার।"

"টাকা দিয়ে তুমি কি করবে?"

"বাবার ভারি অসুখ। বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। এই টাকা দিয়ে তাঁর জন্য ওষুধ কিনে নিয়ে যাব।"

শুনে সত্যবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "আচ্ছা, তুমি যাও। আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি।—না না, দাঁড়াও। আমার সঙ্গেই যাবে,

বৃষ্টি পড়ছে যে। ছাতাটা নিয়ে যাও।"

সত্যবাবু চিকিৎসার বন্দোবস্ত না করলে বুঝি সে যাত্রা চন্দ্রনাথ বাঁচতেন না। তিনি যে কেবল চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলেন তা নয়, তাদের সকলের খাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিলেন। অমলা সুনীল দুজনেই দিনরাত সেবা করে। কখন রান্না চড়াবে? তাই সত্যবাবুর বাড়ী থেকেই তাদের খাবার প্রস্তুত হয়ে আসত।

সত্যবাবু গিয়ে সুশীলের সঙ্গে দেখা করে তাকে বললেন, "সুশীল, তোমার মেসোমশাইয়ের এত অসুখ, তুমি দেখতে তো যাওই না, তা ছাড়া কোনো রকম সাহায্যও কর না;—এই কি উচিত?"

"আমায় কে সাহায্য করে তার ঠিক নেই। আমার এখন টাকার ভয়ানক টানাটানি।" বলে সুশীল মাথা নীচু করে রইল, সত্যবাবুর দিকে চোখ তুললো না। সত্যবাবু কিছু না বলে দুঃখিত মনে উঠে গেলেন।

ম্যানেজারের কাছে খবর নিয়ে তিনি জানলেন, কথাটা ঠিক বটে। আর বেশী দিন এমনিভাবে চললে বাড়ীটা হয়তো ভাড়া দিতে হবে, নয়তো বিক্রী করতে হবে। সুশীলের বাড়ীর সব ব্যবস্থাই এখন ঝি চাকরের হাতে, কাজেই টাকাও জলের মত খরচ হয়ে যায়। সে বেশ বুঝতে আরম্ভ করেছে, মেসোমশাই থাকতে তার খরচ কম হত, অথচ খাওয়া ঢের ভাল হত। বাড়ীর ব্যবস্থাও ছিল ঢের বেশী সুবিধার। এখন তার জিনিসপত্র যেমন গোছানো থাকে না, কাপড়চোপড় হারিয়ে যায়, সময়মত খাবার পাওয়া যায় না। তার জ্বরের সময়ে যখন সুনীল দেখতে এসেছিল, তখন একবার ভেবেছিল বলে 'তোমরা আবার এসে থাক'। কিন্তু নানা দিক দিয়ে তাকে

অসুবিধা, বন্ধুরাই বা কি বলবে। তা ছাড়া মেসোমশাইয়ের তো অসুখ। তাই বলা হল না।

এর মধ্যে একদিন সুনীল যখন দোকানে ওষুধ আনতে যাচ্ছে, দেখল পথের মোড়ে ভারি গোলমাল, ভীড় জমে গেছে। পুলিশ ছুটোছুটি করছে। ব্যাপার কি? কাছে গিয়ে সে ছাখে, বাড়ীর গাড়ী আর ভাড়া গাড়ীতে ধাক্কা লেগে, বাড়ীর গাড়ীখানা উল্টে গেছে। সেই গাড়ীর আরোহীকে লোকজন ধরাধরি ক'রে তুলছে। আরোহীর মুখের উপর চোখ পড়তেই সুনীলের বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ক'রে উঠল—এ যে সুশীল! রক্ত পড়ছে তার কপাল কেটে, সে একেবারে অজ্ঞান। সুনীল তাড়াতাড়ি আর একখানা গাড়ী ডেকে তাতে সুশীলকে তুলল। দুচারজন ভদ্রলোক তাকে সাহায্য করলেন। তাঁরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পর্যন্ত গেলেন তার সঙ্গে। সেখানে ডাক্তারেরা পরীক্ষা ক'রে বললেন, পায়ের হাড় জখম হয়েছে, কপালেও সেলাই করতে হবে। সারতে কিছু সময় লাগবে।

সুশীলের যখন জ্ঞান হল তখন তার মাথায় পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; ভীষণ যন্ত্রণা, সে হাসপাতালের একটা ঘরে শুয়ে আছে। সুনীল বসে আছে তার কাছে। খবর পেয়ে সত্যবাবুও এসেছেন। চোখ খুলেই সুনীলের চেনা মুখ সামনে দেখে সুশীল যেন ভারি আরাম বোধ করল। তার জ্ঞান ফিরেছে দেখে সুনীল বলল, "এবার আমি যাই ভাই। বাবার ওষুধগুলো কিনে নিতে হবে। সত্যবাবু এসেছেন, এখন তোমার কাছে বসবেন।"

সুশীলের টাকা যত ক'মে আসছিল, তার বন্ধুও ক'মে আসছিল

একটি একটি ক'রে। যখন সে আঘাত পেয়ে হাসপাতালের বিছানায় পড়েছিল, তখন তার বন্ধুদের মুখ দেখা যায় নি। সত্যবাবু তার কাছে প্রতিদিন আসতেন। সুনীলও যখনই সময় পেত আসত।

বোকা

চন্দ্রনাথ তখনও শয্যাগত, আর তাঁর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে। ডাক্তার বলেছেন, তিনি যেন কোনও রকমে উত্তেজিত না হন। তাই সত্যবাবু সুনীলকে সাবধান ক'রে দিয়েছেন, "সুশীলের এই দুর্ঘটনার কথা বাবাকে জানিও না। তিনি তাকে ছেলের মত ভালবাসেন। তার এ আঘাত পাওয়ার কথা শুনলে তিনি স্থির থাকতে পারবেন না। হয়ত সেখানে যাবার জন্য জিদ্ করবেন।"

হাসপাতালে সুশীলের প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। একদিন সে সুনীলকে বলল, "বিছানায় প'ড়ে থেকে জেঠামশাইয়ের কথা আমার কেবলই মনে হচ্ছে। বাস্তবিক তাঁর কাছ থেকে আমি ঠিক বাপের মত স্নেহ পেয়েছি। আমার এক এক সময়ে মনে হয়েছে তোমার চেয়েও তিনি আমাকে বেশী স্নেহ করেন। আমার মা-বাবা নেই কিনা, সেইজন্যই এমন বোধ হয়। জেঠামশাইকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি কত যে অন্যায় করেছি, তা এখন খুব বুঝতে পারছি। এবার ভাল হয়ে আমি আবার তাঁকে তোমাদের নিয়ে আমার কাছে আসতে বলব। তিনি কি আসবেন না?"

"কেন আসবেন না সুশীল? আমার তো মনে হয় নিশ্চয়

আসবেন। এখনও তিনি তোমাকে ঠিক আগের মতই ভালবাসেন। তবে, বাবাকে তো নড়ানো যাবে না। তাঁর যে ওঠবার শক্তি নেই।"

এদিকে চন্দ্রনাথ দিন দিন যেন বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে লাগলেন। সুনীল তাঁর কাছছাড়া হয় না, দিনরাত তাঁর সেবা করছে। সুশীলকে দেখতে যাওয়া হয় নি ইদানিং। চন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে সুশীলের খবর জিজ্ঞাসা করেন। সুনীল তখন মুস্কিলে পড়ে যায়; কখনও ভাল করে যেন শুনতে পায় নি, কখনও অন্য কথা পাড়ে, হয়তো সুশীলেরই কোন কিছুর প্রসঙ্গে বলে, "সুশীল আর সেই মন্দ ছেলেদের সঙ্গে মেশে না।" কিম্বা, "সুশীল বোধ হয় আপনাকে অন্য বাড়ীতে যেতে দিয়ে অনুতাপ করছে। তার মনটা তো ভাল।" চন্দ্রনাথ শুনে খুশি হন, বলেন, "আহা তাই যেন হয়। ভগবান তাকে সুমতি দিন।"

সুনীল বাবার ঘরে যাচ্ছে ওষুধ নিয়ে। তার আজ ভারি আনন্দ। সুশীল সেরে উঠেছে, গতকাল সে হাসপাতাল থেকে বাড়ী গেছে। কাল সে বাবাকে দেখতে আসবে। সুশীল এসে কি বলবে? তার বাবা তাকে দেখে কেমন খুশি হবেন। তার পা-ভাঙার কথা আস্তে আস্তে জানাতে হবে বই কি, কেন না সে এখনও লাঠি ভর করে চলে—এইসব ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢুকল। চন্দ্র বললেন তাকে, "তোমাকে আজ ভারি প্রফুল্ল মনে হচ্ছে। কোনো সুখবর আছে কি?"

সুনীল একটু চিন্তা করল। তাঁকে যদি হঠাৎ বলে, কাল সুশীল আসবে, তিনি হয়তো উত্তেজিত হয়ে উঠবেন। তাই সে বলল, "সুশীল বলছিল একদিন তোমাকে দেখতে আসবে। তার পায়ে চোট

লেগেছিল, কদিন সে চলাফেরা করতে পারে নি। তাই আসে নি। এখন পা ভাল আছে।"

"এ্যাঁ? সত্যি? কই আমাকে তো বল নি। যাক ভাল আছে, ভালই।" বলে চন্দ্রনাথ চুপ করলেন। তিনি খুশি হলেন কি না সুনীল বুঝতে পারল না। সে খানিক ইতস্তত ক'রে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "সুশীল এলে কি আপনি খুশি হন না বাবা?—সে আসবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছে। কাল তাকে নিয়ে আসব বলেছি।"

"আনিস্। খুশি কি আর হই না? খুবই খুশি হই বই কি। কিন্তু আনন্দের চেয়ে মনে কষ্টটাই বেশী হবে। তাকে নিয়ে যে আমার ভাবনার অন্ত নেই সুনীল, আবার দিন তো ফুরিয়ে এল। এখন তোদের কি রকম ব্যবস্থা হবে তাই ভাবি।"

সুনীল বাধা দিয়ে বলল, "ওসব কথা এখন থাক। ব্যবস্থা আর নতুন করে কি হবে? যেমন চলছে তেমনি চলবে।"

"না না। তা বললে কি হয়? তুই সরকারবাবুকে সমস্ত জানিয়ে, তোর সম্পত্তি নিস্। প্রমাণ তাঁর কাছে আছে। কিন্তু বাবা, যদি তুই আমাকে কখনও বাপের মত ভালবেসে থাকিস্, তা হলে তুই সুশীলকে নিজের ভাইয়ের মতই দেখিস্। তাকে—" সুনীল বার বার তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করল, মিনতি ক'রে বলল, "বাবা তুমি চুপ কর, অত কথা ব'ল না।" কিন্তু তিনি শুনলেন না, বলে যেতে লাগলেন, "তার যেমন শিক্ষা তাতে সে যে কিছু করে খেতে পারবে তা বোধ হয় না। তুই তাকে দুটি খেতে দিস্। আমিই ভুল করে তার সর্বনাশ করলাম। সে যখন জানবে যে সে গরীবের গরীব, তার হাতে তুলে দেওয়া ঐশ্বর্য যখন কেড়ে নেওয়া হবে, তখন তার বুক যে ফেটে

পড়বে, তখন যে তার দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না—" সুনীল আর তাঁকে বলতে দিল না, সে তাঁর মুখের উপর হাত রেখে মুখ বন্ধ ক'রে গম্ভীর স্বরে প্রতিজ্ঞা করল, "আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সুশীল যে কৃষ্ণধনবাবুর ছেলে নয়, এ আমি কোনও রকমে প্রকাশ করব না। আর, যদিই কখনও প্রকাশ হয়ে পড়ে, আমার সমস্ত সম্পত্তি সুশীলকে লিখে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত মনে থাক, কোনও ভাবনা কোরো না বাবা।"

একান্ত নির্ভরের সঙ্গে চন্দ্রনাথ সুনীলের হাতখানা জড়িয়ে ধরলেন। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না, শুধু বললেন, "একটু জল।" সুনীল জলের গেলাসটা বাড়িয়ে দিতে গিয়ে থতমত খেয়ে গেল,—তাঁর চেহারা কেমন দেখাচ্ছে। "মা, মা" ব'লে ডাকতে ডাকতে সে ঝড়ের মত অমলার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, "শীগ্গির যাও বাবার কাছে। আমি ডাক্তারের বাড়ী যাচ্ছি।"

ডাক্তারের চেষ্টায় চন্দ্রনাথের চেতনা কিছু ফিরে এল। খবর পেয়ে সত্যবাবু এসে পৌঁছেচেন, তাঁর সঙ্গে সুশীলও এসেছে। সত্যবাবুর দিকে চোখ পড়তেই, চন্দ্র কি যেন বললে, বোঝা গেল না। সত্যবাবু তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বলছেন?"

অতি আস্তে, থেমে থেমে, চন্দ্র বললেন, "সুশীল আমার ছেলে,—সুশীল—" ততক্ষণে সুশীলও তাঁর উপরে ঝুঁকে পড়েছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রনাথের চোখ জলে ভ'রে গেল, গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল; তিনি তার দিকে হাত বাড়াতে চেষ্টা করলেন, জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, "সুশীল—বাপ—গোপাল আমার—গোপাল—" আর বলা হল না, কথা বন্ধ হয়ে গেল। অমলা সুশীল সুনীল তাঁকে

ঘিরে রইল। ধীরে ধীরে নিভে গেল জীবন-দীপ।

সুনীল সুশীল অধীর হয়ে কাঁদছে। সত্যবাবু ছিলেন সুনীলের পাশে, তিনি তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। হাত বুলোতে বুলোতে, কপালের চুল সরাতে হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি,—তার কোঁকড়া চুলের নীচে, বাঁ দিক ঘেঁষে লম্বা একটা কালো তিল। বিদ্যুৎ ঝলকের মত মনে খেলে গেল ভদ্রের কথাটা,—'চোখ দুটি অবিকল ছোটবাবুর মত। তেমনি এক মাথা কোঁকড়া চুল।' তিনি নিজের মনে যোগ করলেন,—'তেমনি জাতকের চিহ্ন।' চন্দ্রনাথ বললেন, 'সুশীল আমার ছেলে,' তবে কি—?

চন্দ্রনাথের শেষ কথাগুলি সুশীলের ভাল ক'রে বোধগম্য হয় নি। শোকে অনুতাপে অভিভূত সুশীল ভাববারও অবসর পায় নি। সেই দুদিনের রাত্রি তার সুনীলদের সঙ্গেই কেটেছিল।

রাত পোহালে সত্যবাবু এলেন। সকলের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে, তিনি সুনীল আর সুশীলকে কাছে নিয়ে বললেন, "আমাকে একটু কলকাতার বাইরে যেতে হবে। কবে যাব ঠিক করতে পারি নি। ভাবছি চন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে যাব।"

এর মধ্যে সুশীল বলে উঠল, "ভাই, চল আমরা মাকে নিয়ে বাড়ী যাই।"

কী স্নিগ্ধতা, কী সান্ত্বনা এই কথাগুলির মধ্যে। চোখের জলে সব মালিন্য ধুয়ে মুছে দূর হয়ে গেছে।

সত্যবাবু সুশীলের কথা শুনে মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, "সে খুব ভাল। ওই বাড়ীতে চন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধের কাজ হলে ঠিকই হবে। তা হলে, তার পরে আমি বাইরে যাব'খন।"

পরদিনই সুনীল অমলাকে নিয়ে ৺হরিধনবাবুর বাড়ীতে গিয়ে উঠল। সত্যবাবু সব বন্দোবস্ত করে দিলেন। চাকর-বাকর তো ছিলই।

সে বাড়ীর দোতালার বারান্দার কোণে, যে ঘরে তারা আগে বাস করত, সেই ঘরে অমলা নির্জীবের মত পড়ে থাকে। সুনীল ও সুশীল দুই ভাই সর্বদা তার কাছে কাছে থাকে। একই শোকের আঘাত তাদের তিনজনকে অতি নিকটে টেনে এনেছে। সুনীল ও সুশীলের অকৃত্রিম ভালবাসা অমলার মুহ্যমান প্রাণে আশ্বাস এনে দেয়।

সাতের

যখন কৃষ্ণধনের অনুসন্ধান করবার দরকার পড়েছিল, তখন সত্যবাবু নিজে গিয়েছিলেন মুঙ্গেরে। কৃষ্ণধনের ছেলে সম্বন্ধে সবিশেষ জানবার জন্য তিনি নিজেই একবার কটকে যাবেন ঠিক করলেন। সেখানে অবিনাশের সঙ্গে দেখা করবেন। এই মর্মে শীঘ্রই অবিনাশকে চিঠি লিখলেন।

কটক ষ্টেশন থেকে অবিনাশ সত্যবাবুকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। অবিনাশ এখন বিয়ে করেছে। তিন-চারটি ছেলেমেয়েও হয়েছে তার। আগের বাড়ীতেই এখনও আছে সে। বাড়ীখানা তার বাবা তৈরী করেছিলেন।

সত্যবাবু গোড়া থেকে, অর্থাৎ হরিধন বসুর মৃত্যুর সময় থেকে, চন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত সব কথাই বললেন অবিনাশকে। তজ্জন্য

সন্দেহের কথাও বললেন। কিন্তু বিবরণ অবিনাশ ভগ্নীপতির কাছে শুনেছিল। কিছু আগেই জানত। সে অনেক দুঃখ করল, জামাই-বাবু এত হঠাৎ চলে গেলেন যে, তার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হল না। তবে অসুখের মধ্যে একবার দেখে আসতে পেরেছে যে, তাতেই কিছু সান্ত্বনা। অবিনাশ সত্যবাবুকে বলল, "আমি যখন কলকাতায় জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, সুনীলকে দেখেই মনে হয়েছিল বাসুদেবের ছেলে সুনীল বলে। জামাইবাবুকে আমার সন্দেহের কথা বললামও। তিনি সেই লকেটের প্রমাণকেই বিশ্বাস করেছিলেন।

সত্যবাবু—তাই বোধ হয় আপনি চলে আসবার পর চলে এসেছিলেন আমার বাড়ী, লকেটটা দেখতে চেয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারছি, লকেটের ছবি দেখে কেন অমন অভিভূতের মত বসে পড়েছিলেন তিনি। এই হার-বদলের জন্যই যত বিভ্রাট। আমিও লকেট এত বছরের মধ্যে খুলি নি, ভুলেই গিয়েছিলাম ওটার কথা। কৃষ্ণধনকে আমি চোখে দেখি নি। সুনীল, অর্থাৎ যাকে আমরা বরাবর 'সুনীল' বলে এসেছি, সে যে কৃষ্ণধনের ছেলে এ বিষয়ে এখন আর আমার সন্দেহ নেই। তবু সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। গোড়া থেকেই আলোচনা করা যাক। আচ্ছা, কৃষ্ণধনের স্ত্রীর নাম কি ছিল বলতে পারেন?

যদিও সত্যবাবু মুকুন্দের মাসির বাবার কাছ থেকে শুনেছিলেন, বাসুদেবের স্ত্রী 'রাণী', এবং রাণীর পিসতুতো বোনের নাম 'বিরজা', তবু নিঃসন্দেহ হতে চাইলেন।

অবিনাশ—আমি রাণী দিদি বলেই জানতাম। দিদির কাছে, মানে বিরজা দিদির কাছে, মাঝে মাঝে চিঠি লিখত কিনা। কলকাতা

থেকে ফিরে আমার ইচ্ছা হল রাণী দিদি সম্বন্ধে আরও জানতে। দিদির কাছে যে সব চিঠি লিখেছিল তার দু-একখানা পেলাম। তাতে বিশেষ কিছু নেই। চিঠির বাক্সে, বাসুবাবুর সঙ্গে তার বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রও ছিল। তাতে দেখলাম বরের নাম বাসুদেব বসু ও কনের নাম রাধারাণী। রাধারাণীকে ছোট ক'রে রাণী নামে ডাকা হত আর কি।

সত্যবাবু—যখন কৃষ্ণধনের ছেলে—বাসুদেব না বলে কৃষ্ণধনই বলি আপনাদের কাছে এল, তখন কি তার গলায় হার আর লকেট ছিল?

অবিনাশ—ছিল। দিদি যেদিন জাহাজে রওনা হয় সেদিনও ওই হার আর লকেট খোকাটির গলায়। আপনি হয়তো জানেন, দিদির ছেলেও তখন শিশু। তার গলায়ও ছিল একটি সোনার হার। তাতে লকেট নেই।

সত্যবাবু—আপনার দিদি কার সঙ্গে কলকাতা রওনা হয়েছিলেন? তার নাম কি?

অবিনাশ—তার নাম যদুনাথ বিশ্বাস। আমাদের জানাশোনা লোক। কেন্দ্রাপাড়ায় এক চালের আড়তে কাজ করত। এখনও করে। সে তার স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতা যাচ্ছে শুনে, দিদি জোর করে তার সঙ্গে যাওয়ার বন্দোবস্ত করল। আগে কথা ছিল আমি পৌঁছে দেব কলকাতা, কিন্তু আমার জ্বর হয়ে পড়ল। দিদি যদি দুদিন সবুর করত, আমি ভাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করত, তবে বুঝি এমন দুর্ঘটনা ঘটত না।

সত্যবাবু—মানুষ কত কল্পনা করে। কিন্তু মানুষের হাতে তো

কিছু নেই।—সেই যদুনাথ কি হার-বদলের কথা জানে?

অবিনাশ—তা কি করে বলি? তবে দুটি ছোট শিশু, দুজনেরই গলায় সোনার হার, ভুলে অদল-বদল হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়।

সত্যবাবু—আচ্ছা, যদুনাথকে কি একবার পাওয়া যেতে পারে?

অবিনাশ—খবর দিলে পাওয়া যাবে, কিছু সময় নেবে। তার চেয়ে আমি বরং চলে যাই কেন্দ্রাপাড়ায়। তার সঙ্গে দেখা ক'রে সব জেনে আসি। যদু কিছু বলতে না পারলেও, তার স্ত্রী জানবে হয়তো।

সত্যবাবু—কেন্দ্রাপাড়া এখান থেকে কত দূর?

অবিনাশ—খাল দিয়ে নৌকোয় গেলে একটা দিন লাগে। আমি কাল সকালে বেরোলে, পরশু সন্ধ্যায় ফিরতে পারব। খাওয়া-দাওয়ার পর আমি গিয়ে নৌকো ঠিক করে আসব। আপনি আমার বাড়ীতেই থাকুন। আপনার কোনও অসুবিধা হবে না।

সত্যবাবু—না না, অসুবিধা কেন হবে? তবে কিনা আমাকে একটু শীঘ্র ফিরতে হবে, কাজ আছে কলকাতায়। তা হলে পরশু আপনি এলে পরই ফিরব।

খেতে বসে অবিনাশ সত্যবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি এর আগে কখনও এদিকে এসেছেন?" তিনি বললেন, "কটকে আসি নি, পুরীতে একবার এসেছিলাম।"

অবিনাশ—আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে। বেশ নৌকোয় বেড়িয়ে আসবেন 'কেনাল' দিয়ে। ভাল লাগবে। কেনালের 'লক্ গেট্' দেখবার জিনিস। আর তা হলে, নিজেই যদুর মুখ থেকে সব শুনতে পারবেন। যা আপনার ইচ্ছা, জিজ্ঞাসাও করতে পারবেন।

সত্যবাবু—বেশ তো। কিন্তু রাত্রে কোথায় থাকবেন মনে করেছেন? ডাক বাংলো আছে?

অবিনাশ—রাত্রে নৌকোতেই থাকতে পারব। তা ছাড়া আমার এক বন্ধু সেখানে আছে। যদি তার অসুবিধা না হয়, তার বাড়ীতেও থাকতে পারি।

পরের দিন অবিনাশের সঙ্গে সত্যবাবু নৌকোয় যাচ্ছেন খাল দিয়ে। দুই পাশে গ্রাম, ক্ষেত, আম বাগান। কোথাও জলের ধারে সারি সারি কেয়া ফুলের ঝোপ, কেয়া গাছে সাপ জড়িয়ে ঝুলছে দেখা যাচ্ছে। অনেক আম গাছ দুধারে। ফাল্গুন মাস, গাছ ভরে আমের বোল ফুটেছে, বাতাস গন্ধে ভুরভুর।

সন্ধ্যার আগে তাঁরা কেন্দ্রাপাড়ায় পৌঁছে গেলেন। সত্যবাবুকে নৌকোয় রেখে, অবিনাশ গেল যদুর খোঁজে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সে ফিরে এল। তার সঙ্গে এল তার বন্ধুবর, আর এল যদু, যদুর পিছনে ঘোমটা টেনে তার বৌ।

অবিনাশের বন্ধু সত্যবাবুকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল তার বাড়ীতে রাত কাটাতে। কিন্তু সেখানে গেলে পাছে তাদের কোনও মুস্কিল হয়, আগে খবর দেওয়া হয়নি, এই ভেবে সত্যবাবু রাজী হলেন না। তখন বন্ধুটি বলল, "তবে আপনাদের রাত্রের খাবার আমার বাড়ী থেকে আসবে। এতে 'না' করবেন না।"

সে চলে গেলে, যদু আর যদুর বৌ এগিয়ে এসে সত্যবাবুকে গড় হয়ে প্রণাম করল। হার-বদলের জন্য গোলমাল হয়েছে, যদু আর যদুর স্ত্রী শুনল। যদু বলল, "আমি তো মা ঠাকরুণের কাছে বড় থাকতুম না। যাওয়া-আসা করতুম, খবর নিতুম। বৌকে জিজ্ঞাসা

করুন। সে যদি জানে। হ্যাঁরে, জানিস্ কিছু? যা মনে আছে বাবুকে বল্।"

মধুর বৌয়ের খুব মনে ছিল হারের ঘটনা। সে তখনি বলল, "মনে আছে বই কি। দুটিই তো শিশু ছিল, দুজনেরই গলায় ছিল সোনার হার। এক খোকার গলায় হারের ধুকধুকিটি দেখে অন্য খোকা টানাটানি করতে লাগল বারবার। আমি মা-ঠাকরুনকে বললুম, 'ওটি ওর ভারি পছন্দ।' মা-ঠাকরুনও হেসে হেসে এর হার ওর গলায়, ওর হার এর গলায় পরিয়ে দিলেন। পরে যখন খুলতে গেলেন হার, খোকা কিছুতেই দেবে না, কেঁদে গড়াগড়ি। মা বললেন, 'আচ্ছা ঘুমোলে খুলে নেব'। তার পরেই তো তুমুল তুফান আরম্ভ হল।"

সত্যবাবু—ঝড়ের সময়ে, শুনলাম, যাত্রীরা নৌকোয় উঠেছিল। কি রকম হয়েছিল বল দেখি।

মধুর বৌ—বাবা রে, সে রাতের কথা মনে করতেও গায়ে কাঁটা দেয়। জাহাজের বাঁশী, লোকের গোলমাল আর ঝড় বৃষ্টিতে মিলে যেন এক প্রলয় কাণ্ড লাগিয়ে দিলে। শুনলুম জাহাজ ডুবে যাবে। কতগুলো নৌকো এসে দাঁড়াল জাহাজের পাশে। সবাই হুড়োহুড়ি করে উঠল নৌকোয়। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে মা নামলেন আগে আগে, পিছনে পিছনে আমি। নৌকোতে কি পা রাখা যায়? উল্টে ফেলে দিতে চায় যেন। খালাসী একজনের কোলে ছিল একটি খোকা, আমি তাকে নিলুম। কোনও রকমে বসলুম। মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'গোপাল কই, গোপাল?' হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে গোপালই বলেছিলেন বটে—সে সব কি তাই তখন কানে গিয়েছিল? মা মনে

ঢুকেছিল ?—আমি বললুম, 'ওই যে পরের নৌকোতে, ওর কোলে খোকাবাবু রয়েছে।'

সত্যবাবু—তাঁর নিজের খোকাকে তিনি গোপাল বলে ডাকতেন ?

মধুর বৌ—একজনকে ডাকতেন 'গোপাল', একজনকে সুশীল। কে কোন্ জন তা আমি ঠিক বলতে পারব না। দুটিকেই সমান যত্ন করতেন, সমান আদর করতেন, কোন্‌টি যে নিজের, বোঝবার যো ছিল না। এমন মানুষ। সত্যি।—তারপর তো কিছু দূর যেতে না যেতে, বাস্—নৌকো গেল উল্টে। অথই জলে পড়লুম সকলে।—যখন চোখ খুললুম, তখন ডাক্তারখানায়।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করল মধুকে, "যে খোকাটি আগে চন্দ্রবাবুর কাছে দেওয়া হল, সেটি চন্দ্রবাবুর ছেলে কি না, তোমরা জানতে ?"

মধুর দিকে দেখিয়ে তার বৌই জবাব দিল, "ও তো খোকাদের কাছেই যায় নি। মা অবিশ্যি বলেছিলেন একটি তাঁর বোনের ছেলে। কিন্তু আমি ক্রমাগতই ভুল করতুম কোন্‌টি কে। মাত্র তো তিনদিন দেখেছি।"

সমস্ত সন্দেহ এখন মিটে গেল। কটকে ফিরে সেই রাত্রেই সত্যবাবু কলকাতা যাবেন। যাবার আগে অবিনাশ তাঁর হাতে এক জোড়া সোনার মাকড়ী দিয়ে বলল, "দিদি এ দুটি সব সময়ে পরতো। একটা আঁকড়া একটু ঢিলে হয়ে যায়, তাই যাবার সময়ে রেখে গিয়েছিল, মেরামত করিয়ে পরে পাঠিয়ে দিতে। গোপালকে এ দুটি দেবেন।"

বাড়ীর ফটকে গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। সত্যবাবু যখন গাড়ীতে

উঠলেন, দেখলেন, একটা কাঠ-চাঁপার গাছ ভরে ফুল ফুটেছে। তিনি বললেন, "বাঃ, সুন্দর ফুল তো!"

অবিনাশ বললে, "ও গাছটি দিদির হাতে লাগানো। ওর একটা ডাল পরে পাঠিয়ে দেব। ওখানে পুঁতবে ওরা।"

আঠারো

কটক থেকে ফিরে, সত্যবাবু তখনি সুনীলদের কাছে যেতে পারলেন না। মহা ভাবনায় পড়লেন তিনি। কেমন ভাবে কথাটা প্রকাশ করা যায় দুই ভাইয়ের কাছে। সুনীল জানবে চন্দ্রনাথ তার আপন বাবা ছিলেন না, জানবে সে পিতৃমাতৃহীন। খুবই আঘাত পাবে নিশ্চয়। তবে, তার প্রকৃতি শান্ত ধীর, সে সামলিয়ে নিতে পারবে। তা ছাড়া, অন্যদিকে তার তো আনন্দই হওয়া সম্ভব, কেন না সে ৺হরিধন বসুর উত্তরাধিকারী হবে।

আর সুশীল? তার অবস্থা যে কি হবে, ভেবে কূলকিনারা পাওয়া যায় না। সম্পত্তি সে হারাবে, সেটাই কত বড় নিষ্ঠুর আঘাত। তার উপরে সে জানবে—চন্দ্রনাথ তার আপন বাবা ছিলেন। সেই, স্নেহময় পিতাকে সে পেয়েও পেল না। তাঁর প্রতি নিজের ব্যবহার স্মরণ করে তার মনস্তাপের সীমা থাকবে না। এই অল্প বয়সে এমন নিদারুণ অবস্থায় তাকে পড়তে হল। তবু বেশী দেরী করাও উচিত নয়। তাই সত্যবাবু ৺হরিধন বসুর বাড়ীতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সত্যবাবু সুশীলের শোবার ঘরে গেলেন। সেখানে সুশীল শুয়েছিল বিছানায়। পাশে সুনীল বসেছিল। সুশীল জিজ্ঞাসা করছিল, "দাদা, বাবা কেন বলেছিলেন 'সুশীল আমার ছেলে?'"

"ছেলের মতই তোকে ভালবাসতেন না কি?"

"তা বাসতেন। আমিও তো তাঁকে বাবাই ডাকতাম। বন্ধুদের পাল্লায় প'ড়ে আমার কি যে হল।"

সত্যবাবুকে দেখে সুনীল একখানা চেয়ার এগিয়ে দিল। সুশীল উঠে বসল। সুশীল বলল, "দাদাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, বাবা কেন বললেন 'সুশীল আমার ছেলে'। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।" সুনীল বলল, "বললাম তো; তোকে ছেলের মতই ভালবাসতেন তিনি।"

সত্যবাবু তখন ধীরে ধীরে সংক্ষেপে সবই বললেন দুজনকে।

সুশীলের প্রাণ কেবল হাহাকার করছে। দুঃখে আর অনুতাপে সে একেবারে ভেঙে পড়েছে। হায়, আগে যদি জানত! আপন বাবার স্নেহ যদি একটু উপভোগ করতে পারত! কেবলই মনে হচ্ছে তার।

অনেক অনেকদিন লাগল তার একটুখানি সামলাতে। কচি অল্প বয়স, মন নরম, অবশেষে একটু প্রকৃতিস্থ হল সুশীল। সে এত অস্থির হয়ে পড়েছে জেনে, তার মামা অবিনাশ কিছুদিন এসে রইল তার কাছে। অবিনাশ সুশীলের নিকটতম আত্মীয়। সে আসাতে সুশীলের ভাল লাগল খুব।

সন্ধ্যা হয়েছে, সুনীল সুশীল বারান্দায় বসেছে। সত্যবাবুও আছেন

সেখানে। ক'দিনে সুশীল অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে, অনেক বয়স বেড়ে গেছে যেন। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ। এর মধ্যে সুশীল বলল, "দাদা, বাবা আমাকে 'গোপাল' ব'লে ডেকে ছিলেন, সে ডাক সব সময়ে আমার কানে বাজছে। মাও আমাকে গোপাল বলছেন। তোমরাও সেই নামেই ডেকো।" সুনীলের চোখ ছলছল হয়ে এল, বলল, "তাই ডাকব ভাই।"

সুনীলের ব্যবহারে এখনও পর্যন্ত মোটেই প্রকাশ পায় নি যে সে এসব কথা জানত। গোপাল আবার বলল, "তা হলে দাদা, আমি তো তোমার বাড়ীঘর টাকাপয়সা ভোগ করেছি এতদিন।—কত যে নষ্টও করেছি।—কি ভয়ানক অন্যায় করে ফেলেছি!"

সত্যবাবু তাকে এত চঞ্চল হতে দেখে সান্ত্বনার স্বরে বললেন, "তুমি তো ইচ্ছা করে কিছু কর নি। আমাদেরই ভুলের জন্য কতকটা এ ব্যাপার ঘটল। যাক, এখন ভুল সংশোধন ক'রে নিলেই হবে। সুনীল তোমাকে নিশ্চয় ভাইয়ের মত কাছে রাখবে। কি বল সুনীল?"

"দেখুন, আমি এ সমস্ত কথা আগেই জেনেছিলুম, বাবা বলেছিলেন। আমি নিজে থেকে তাঁর কাছে কথা দিয়েছিলাম যে, এ বিষয়ে আমি কাউকে কিছু বলব না; এবং যদি জানাজানি হয়, তবে সুশীলকে সমস্ত সম্পত্তি আমি লিখে দেব। সেইটুকুর বন্দোবস্ত করবেন। আর কিছুই বলবার দরকার নেই।"

সুনীল এরকম বললে, সত্যবাবু চমৎকৃত হলেন। গোপাল আপত্তি ক'রে উঠল, "না না, এ হতে পারে না। তোমার উপর আর বেশী অন্যায় আমি হতে দেব না। এ সম্পত্তি আমাকে দিলে আমি মনে

শান্তি পাব না দাদা। উঃ—কি অন্যায় করেছি। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। টাকা কড়ি নষ্ট ক'রে ফেলেছি। আমার কি হবে দাদা?"

সুনীল হাসতে হাসতে বলল, "কি আবার হবে? দাদার কথা মেনে চলতে হবে আর কি। বুঝলি? আপত্তি করিস্ না। বাবার কাছে যে আমি সত্যে বাঁধা আছি, সেটা ভুলিস্ না।"

সত্যবাবু মীমাংসা ক'রে দিলেন, "বেশ। সুনীল তুমি গোপালকে সম্পত্তি লিখে দাও। তা হলে তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে। তারপর গোপাল তুমি দাদাকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দাও।"

সুনীল ভীষণভাবে প্রতিবাদ করল, "হতেই পারে না,—হতেই পারে না।"

সত্যবাবু তখন বললেন, "আচ্ছা, তবে মাঝামাঝি হোক। গোপাল, তোমারও মনে দুঃখ থাকবে না কিছু, সুনীলও বঞ্চিত হবে না। দুজনে আধাআধি ভাগ ক'রে নিও। কেমন?"

তিনি গোপালের হাতে তার মায়ের মাকড়ী, এবং সুনীলের হাতে তার হার ও লকেট দিলেন।

সুনীল বড় হয়েছে, হার তো পরবে না। তাছাড়া, ছেলেদের হার এখন গলায় হবেই বা কেন? লকেট খুলে নিয়ে, সে ওটিকে কালো সুতোয় গেঁথে, অতি [illegible] গলায় পরল। জামার নীচে, তার গায়ে লেগে রইল [illegible]।